রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা

দাম—দেড় টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেটকাফ প্রেস
৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।

জীবন ও বাণী

দেশকে যারা ভালবাসে

তাদেরই হাতে দিলাম

যাঁর কর্ম্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন সমস্যা আজ সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে কল্পান্তরের সৃষ্টি করেছে, তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিবৃত্ত জাতির কাছে যে কত মূল্যবান, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই বিজয়ী কর্ম্মবীরের আশৈশব জীবনকথা, তাঁর জাতীয় জীবনের কঠোর সংগ্রাম, দেশাত্মবোধ ও কর্ম্মনিষ্ঠার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার আন্তরিক আগ্রহ আজ সকলের মনেই জেগে উঠেছে। সুভাষ আমাদের অতি প্রিয়, তাই তাঁর জীবন ও বাণী আমাদের কাছে প্রিয়তর।

দোলপূর্ণিমা

১৩৪৫



রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

দেশে দেশে যুগে যুগে কত মানুষ পৃথিবীর বুকে জন্মিয়াছে, আবার কিছুকাল পরে মাটির সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু পৃথিবী তাহাদের কথা একটা যুগের জন্যও মনে রাখে নাই। সেই অসংখ্য লোকের জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখিবার অবসর পৃথিবীর নাই। পৃথিবী শুধু হিসাব রাখে তাঁহাদেরই, যাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু দেশকে গৌরবান্বিত করে—ত্যাগ ও আদর্শ মানুষের বুকে গড়িয়া তোলে স্মৃতির তাজমহল।

নিজের সুখদুঃখকে তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা মানুষ হইয়াও মানুষের পূজ্য। তাঁহাদের জন্মে দেশের মাটি যেন সার্থক হইয়া উঠে ; সমগ্র জাতি হয় গৌরবান্বিত। এই মনীষিদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও ব্রতসাধনার কাহিনীই জাতির ইতিহাসে পায় গৌরবের স্থান। মানুষের চোখের জল মুছিয়া দিতে তাঁহারা আজীবন যে কঠোর ব্রতসাধন করেন, হাসিমুখে যে দুঃখ ও লাঞ্ছনা

বরণ করেন, মানুষ তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে পারে না। তাই, দেশপ্রেমিক লাভ করেন জাতির ভালবাসার অর্ঘ্য, শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তাঁহাদেরই অন্যতম।

ভারতের কল্যাণসাধনায় ব্রতী হইয়া সুভাষচন্দ্র কোনও দেশপ্রেমিক অপেক্ষা কম দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই। স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের গৌরবময় প্রতিষ্ঠাকে তুচ্ছ করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন দুঃখময় ব্রতচারীর জীবন। তাই সেই পরদুঃখকাতর দেশপ্রেমিক আজ আমাদের পূজার আধার। তাঁহার ত্যাগের কাহিনী আজ ইতিহাসের আদরনীয় বস্তু।

সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি চব্বিশপরগনার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। তিনি স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু মহাশয়ের সপ্তম পুত্র। জানকীনাথ কটকের সরকারী উকিল ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাবান উকিল তৎকালে অতি অল্পই ছিল। তিনি কটক বার বা উকিল সমিতির সর্ব্বজনমান্য নেতা ছিলেন। নিজের উদারতা ও আন্তরিকতার জন্য জানকীনাথ খুব অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং উকিল হিসাবে কটকে তিনি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই জনপ্রিয়তার জন্যই তিনি সুদীর্ঘকাল কটক মিউনিসিপালিটী ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার স্মরণীয় কার্য্যকলাপের সম্মানার্থ রাজসরকার

তাঁহাকে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন। পুত্র সুভাষ-চন্দ্রের প্রাণে আজ যে দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার স্নিগ্ধ ছায়াবীথি আমরা দেখিতে পাই, সে প্রেমের বীজ মূলে নিহিত ছিল জানকীনাথের প্রাণে। দেশপ্রেম ও ত্যাগের আদর্শ তাঁহার জীবনেও কম ছিল না। আইন-অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য ভারত সরকার যখন কঠোর পন্থা অবলম্বন করেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যে ব্যথিত হইয়া জানকীনাথ রাজ-প্রদত্ত সম্মান অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়া দেশবাসীর অশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। সুভাষচন্দ্রের মাতা একজন আদর্শ হিন্দু রমণী। তাঁহার নাম প্রভাবতী দেবী। তাঁহার মত দানশীলা ও ধর্ম্মপ্রাণা রমণী এই যুগে বিরল। তাঁহার আটটি পুত্র ও ছয়টি কন্যার মধ্যে বর্ত্তমানে ছয়টি পুত্র ও দুইটি কন্যা জীবিত আছেন। তাঁহার এই ছয়টি পুত্রের নাম—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু, ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। পরলোকগত সন্তোষচন্দ্র বসু তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা-ভগ্নীদের চরিত্রে প্রভাবতী দেবীর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সহৃদয়তা, সারল্য ও অমায়িক স্বভাবের দরুণ প্রভাবতী দেবী পারিবারিক জীবনে

সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। পিতার স্বাদেশিকতা এবং মাতার পরদুঃখ-কাতরতা এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে সুভাষচন্দ্রের জীবন আজ ত্যাগ-মাহাত্ম্যে এত গৌরবময় হইয়াছে।

দুই

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের সূচনা কটকের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি তথায় অধ্যয়ন করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুল হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি তাঁহার শ্রেণীতে সর্ব্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিতেন; এই জন্য শিক্ষকবৃন্দেরও তিনি অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজীতে তিনি এত ভাল করিয়াছিলেন যে, পরীক্ষক

জ্ঞান

নিজেও ঐরূপ পারিতেন না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন তিনি শ্রদ্ধাভাজন প্রবীন শিক্ষক বেণীমাধব দাস মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। বেনীবাবুর আদর্শ চরিত্র সুভাষচন্দ্রকে মুগ্ধ করে। তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৪ বৎসর বয়সে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীপাঠে এবং ধ্যানধারণা অভ্যাসে সুভাষচন্দ্রের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। মাতৃদেবীর সহিত তিনি ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে পরীক্ষার পড়া অপেক্ষা দরিদ্রনারায়ণের সেবা, রুগ্নের শুশ্রূষা ও দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে তাঁহার প্রায় সময় কাটিতে লাগিল। এতৎসত্ত্বেও যে সুভাষচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা হইতে সুভাষচন্দ্র কিরূপ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কলেজ-জীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার একদল বন্ধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশানুযায়ী স্ব স্ব জীবন গঠন করিবার সঙ্কল্প করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের কথা। সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। আই-এর পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে তিনি সংস্কৃত, গণিত ও তর্কশাস্ত্র বা লজিক

বাছিয়া লইলেন। এই সময় ৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ মেডিকাল মেসে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের (তখন মেডিকাল কলেজের ছাত্র) চেষ্টায় একটি দল গঠিত হয়। বহু মেধাবী ছাত্র এই দলে যোগদান করিয়াছিল; কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া দেশসেবা ও ধর্ম্মজীবন যাপন করাই তাহাদের মূলমন্ত্র ছিল। সুভাষচন্দ্রও এই দলে যোগদান করিলেন। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ধর্ম্ম তখনও সুভাষচন্দ্রের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তাই ধর্ম্মভাবাপন্ন কতিপয় ছাত্রের সহিত সুভাষচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবল প্রেরণা ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র অকস্মাৎ একদিন জনৈক বন্ধুর সহিত গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেন। তিনি হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা, বারাণসী ও গয়া প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। আগ্রাতে তিনি প্রেমানন্দ বাবাজী নামক উচ্চশিক্ষিত ও সদালাপী সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রেমানন্দ বাবাজী গৃহীর মত জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার এই জীবন-ধারা সুভাষচন্দ্রের মনঃপূত হইল না। সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু বৃন্দাবনে আসিলে ৺রাজর্ষি বনমালী রায় তাঁহাদের জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের ধীশক্তি ও মনোভাবের পরিচয় পাইয়া সাধুপ্রবর রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মুগ্ধ

হন। তিনি তাঁহাদিগকে বারাণসীতে গমন করিয়া জ্ঞান-মার্গের চর্চ্চা করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশানুসারে বারাণসীতে সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু কিছুকাল যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনের রাখাল মহারাজের (৺ব্রহ্মানন্দ স্বামী) সহিত অবস্থান করেন। তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেন—

'বাপ-মা-কে না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছ—বাড়ী ফিরিয়া যাও।'—এই পরামর্শানুসারে তাঁহারা বারাণসী ত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধগয়ায় উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা কিছুকাল কাটাইলেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহারা বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল যে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিলাসিতায় জীবন যাপন করেন।—বিরক্ত হইয়া সুভাষচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। নানা অনিয়ম-অত্যাচারে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য তখন বিশেষ খারাপ হইয়া যায়। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার কিছুদিন পরেই তিনি টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকেন। পূজার সময় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তিনি কার্সিয়াং গমন করেন। তথায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়। তিনি পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আই-এ পাশ করিবার পর সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই

বি-এ পড়িতে থাকেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইলেন। নিজের চরিত্র ও কর্ম্মকুশলতায় সুভাষচন্দ্র স্বল্পকালের মধ্যেই ছাত্রগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং তাহাদের নেতৃস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ এফ ওটেন (পরে জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর) নামক ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য কলেজের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করে। সুভাষচন্দ্র ধর্ম্মঘটকারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরে মিঃ ওটেন পুনরায় ছাত্রদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন এবং ছাত্রেরাও ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ছাত্রেরা মিঃ ওটেনকে প্রহার করে। এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য কর্তৃপক্ষ কতিপয় ছাত্রদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাদিগকে কলেজ হইতে বহিস্কৃত করা হয়। অধ্যাপককে মারপিটের অভিযোগে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিতাড়িত ছাত্রদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রও একজন ছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাম অন্তরীণ হন। এইরূপে কিছুকালের জন্য সুভাষচন্দ্রের অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে। এই অবস্থায় কটকে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। তবে উল্লিখিত 'ওটেন' সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। উক্ত ঘটনা হইতে শাসকশ্রেণীর ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার স্পৃহা তাহার মনে জাগরূপ হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্রসম্মেলনের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে অভিভাষণ

প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ—

"আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন 'সাধারণে'র দিক দিয়া নিষ্কলঙ্ক নহে। যে দিন কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহার নিকট ডাকিয়া নিয়া আমাকে কলেজ হইতে সসপেণ্ড করার আদেশ জানাইয়াছিলেন, সেই দিনের কথাগুলি আমার কানে এখনও বাজিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—'তুমিই কলেজে সর্ব্বাপেক্ষা অশান্তিকারী।' সেই দিন আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। মহৎ কাজের জন্য দুঃখ ভোগ করার আনন্দ এই আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিলাম। জীবনের অন্য সব আনন্দ এই আনন্দের নিকট নিষ্প্রভ। আমার জীবনে এই প্রথম নীতি ও স্বাদেশিকতার কঠোর পরীক্ষা হইয়া গেল। এই কঠোর পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হইলাম, তখন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মপন্থা চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৺স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি লাভ করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্স- লইয়া স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক বি-এ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোর' নূতন গঠিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সৈন্যদলে যোগদান করেন। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতেই

সুভাষচন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি দর্শনশাস্ত্রের প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) বিষয় লইয়া এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট আই-সি-এস (ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্) পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বিলাত যাত্রার প্রস্তাব করেন। বিলাত যাত্রার ইচ্ছা সুভাষচন্দ্রের মোটেই ছিল না। বিলাত যাত্রা দেশসেবার অন্তরায় হইবে কিনা—এই চিন্তা তখন তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। অবশেষে পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার আট মাস পরেই তিনি আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ইংরাজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবেন না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করিয়া তিনি অধ্যাপকের কার্য্যে জীবন কাটাইবেন। যখন তিনি আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন, তখন তিনি বন্ধুর নিকট লিখিলেন—'তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে, আমি আই-সি-এস পাশ করে ফেলেছি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি। এখন উপায় ?'—বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া সুভাষচন্দ্র পূর্ব্বেই

মনস্থ করিয়াছিলেন যে, আই-সি-এস পাশ করিতে পারিলে তিনি উহা ছাড়িয়া দিবেন এবং চাকুরীজীবি দেশবাসীর সমক্ষে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্কল্প গৃহীত হয় এবং সমগ্র দেশ মহাত্মা গান্ধীর অধিনায়কত্বে সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে, শৃঙ্খলিতা ভারত মাতার সকরুণ আহ্বানে তখন তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুভাষচন্দ্র তখনও বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। ভারত-সচিবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিসে (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার একবৎসর পর) পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের (অনার্স সহ) বি-এ ডিগ্রী লইয়া তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিলাতে তিনি যখন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ কে, পি, চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বিলাতে ছিলেন। তাঁহাদের সহিত তথায় সুভাষচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল।

তিন

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুভাষচন্দ্র প্রথমেই মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার নিকট স্বীয় সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর পরামর্শানুযায়ী দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার অনুচররূপে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এই সময় ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের অ্যাসে মাষ্টারের (Assay Master) পদ ত্যাগ করেন। তাঁহাদের এই বিরাট ত্যাগের ফলে বাঙ্গলার অসহযোগ আন্দোলনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহাদের এই ত্যাগ মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল।

১৯২১ সালের মে মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সুভাষচন্দ্রকে ন্যাশনাল কলেজের (National College) অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই কলেজটি দেশবন্ধুরই প্রতিষ্ঠিত। দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচারবিভাগের ভারও অর্পণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচারকর্ত্তারূপে তাঁহাকে অনেক বাধা-বিঘ্ন ও অপ্রিয় সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বাংলার কংগ্রেসী কার্য্যকলাপের বিষয়ে তখন যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উত্তরে সুভাষচন্দ্র যে কয়টি বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া দেশের জনসাধারণ সন্তুষ্ট হন এবং বিরুদ্ধ সমালোচকগণও নীরব হইয়া যান। সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিসমূহ পাঠ করিয়া তখন 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করিয়াছেন। বৃটিশ আমলাতন্ত্র একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎবিশিষ্ট কর্ম্মচারী হারাইলেন এবং কংগ্রেস আমলাতন্ত্র তাঁহাকে লাভ করিলেন।......ইস্তাহার প্রচারবিদ্যায় শ্রীযুক্ত বসু সিমলাকেও হারাইয়াছেন।"

এই সময় বাঙ্গালাদেশে স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়নকালে ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরে যোগদান করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, উহা এখন বিশেষ কাজে লাগে। যুবরাজের ভারত-আগমন

উপলক্ষে ১৯১৭ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বাঙ্গলাদেশে যে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়, সুভাষচন্দ্রের সুদক্ষ পরিচালনায় উহা পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। শুধু বাঙ্গালায় নয়—ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরগুলিতে এই হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই দিন কলকোলাহলমুখর কলিকাতা মহানগরী একটি জনমানবহীন নগরীর আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৭ই নভেম্বরের হরতালের বৈশিষ্ট্য এই যে, জনসাধরণ স্বেচ্ছায়ই উহা প্রতিপালন করিয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই শান্তি রক্ষিত হইয়াছিল; দেশের কোথাও যেন কোনপ্রকার গণ্ডগোলের সৃষ্টি না হয়, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কেবলমাত্র উহারই তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাফল্যে ইউরোয়পীদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; এই হরতালকে তাহারা যুবরাজ ও ভারতসম্রাটের মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া ব্যাখ্যা করিল। জনসাধারণের রাজভক্তির অভাবে তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রগুলি ভদ্রতা ও ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অসহযোগীদের, বিশেষতঃ কংগ্রেসের প্রতি বিষোদ্গার করিতে লাগিল। ইহার ফলে সরকার প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দমন-নীতির আশ্রয় লইলেন। ১৯শে নভেম্বর তারিখে বাঙ্গালা সরকার এক ইস্তাহারের মারফৎ কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছা-সেবক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন

২০শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের এক ঘোষণাক্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীতে তিন মাসের জন্য জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইল। মফঃস্বলের আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার অভিভাবকগণ অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কংগ্রেস ও খিলাফৎ প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালা সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, সেই আদেশের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীরা এক বিবৃতি প্রচার করেন এবং প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্যবর্গকে বঙ্গীয় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সদস্যতালিকাভুক্ত হইতে অনুরোধ করেন।

ইহার পরেই আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। প্রায় তিন মাস হাজতবাসের পর, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দণ্ডাদেশ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'Have I robbed a fowl !'—'আমি কি মুর্গীচোর যে অত কম দণ্ড হ'ল?'—জেলে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ লাভ করেন। জেলে সুভাষচন্দ্র একাধারে দেশবন্ধুর পাচক ও প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন।

সময়ে সময়ে দেশবন্ধুর শিক্ষকতা করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার ঘটিত।

৺পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁহার গ্রন্থে * লিখিয়াছেন ঃ—

"জেলে দেশবন্ধুর বাসগৃহটি রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও জাতীয়তাবাদীদের একটি তীর্থক্ষেত্রের আকার ধারণ করে।...এই সময় তিনি অন্যতম বন্দী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট নীতিদর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কারাগারে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর আরও অধিকতর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিছুদিন পরে উত্তর-বঙ্গের বন্যাপ্রপীড়িতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত তিনি তথায় গমন করেন। উত্তর-বঙ্গ জলপ্লাবন সাহায্য সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কর্ম্মশক্তির জন্য কেবলমাত্র জনসাধারণ প্রীত হইয়াছিল এমন নহে, গবর্ণর লর্ড লিটনও স্বয়ং সান্ধ্যাহারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ উহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। দেশবন্ধুর সহিত 'সুভাষচন্দ্র

* Life & Times of C. R. Das.

তথায় যোগদান করেন। দেশবন্ধুর প্রস্তাবানুসারে যখন উক্ত অধিবেশনে 'স্বরাজ্যদল' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সহকারীরূপে এই দলের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। গয়া কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল প্রবেশের কর্ম্মপন্থা সমর্থন করেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর সুভাষচন্দ্র 'বাঙ্গলার কথা' নামক একখানি বাঙ্গলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। দেশবন্ধু তখন সুভাষচন্দ্রের উপর স্বরাজ্যদলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের সুযোগ্য পরিচালনায় এই পত্রিকার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে সুভাষচন্দ্র প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘ (Young Bengal Party) নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলের অনুষ্ঠান-পত্র হইতে পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজলাভই সুভাষচন্দ্রের ঈপ্সিত ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের সহিত এই দলের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল।

শ্রমিকগণের আর্থিক দুরবস্থা দূরীভূত করার প্রতি বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শ্রমিকগণ যাহাতে অতিরিক্ত রিশ্রমের হাত হইতে অব্যাহতি পায়, তাহাদের বেতনের

নিম্নতম হার নির্দ্ধারিত থাকে এবং অসুখের সময়ও তাহারা যেন বেতন ভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তরুণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত, শ্রমিকগণ যাহাতে বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন এবং দুর্ঘটনাস্থলে ক্ষতিপূরণ পায়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও তরুণ সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

চাকুরী

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক নির্ব্বাচন হয়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে 'স্বরাজ্যদল' কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন এবং দেশবন্ধু মেয়র নির্ব্বাচিত হন। দেশবন্ধুই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম কংগ্রেসী মেয়র। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। মাসাধিক কাল বিলম্বের পর বাঙ্গালা সরকারের দপ্তর এই নিয়োগ অনুমোদন করেন। এই পদের বেতন মাসিক তিন সহস্র টাকা। সুভাষচন্দ্র ঐ পদের জন্য মাসিক মাত্র দেড় সহস্র টাকা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ঐ পদে তিনি দীর্ঘ দিন অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তিনি ৩নং রেগুলেশনে বিনাবিচারে বন্দী হন। শ্রীযুক্ত বসুর গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ স্বরাজ্যদলের সমস্ত কাগজপত্র, এমন কি কর্পোরেশনের ফাইল.

পর্য্যন্ত হস্তগত করে। শ্রীযুক্ত বসুকে প্রথমতঃ আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। আলীপুর জেলে অবস্থানকালেও তিনি কর্পোরেশনের কাজকর্ম্ম চালাইতেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করিলেন। এই জেলে তাঁহাকে কয়েক মাস রাখা হয়। পরে তাঁহাকে ব্রহ্ম-দেশের মান্দালয় জেলে নির্ব্বাসিত করা হয়। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে কলিকাতা কর্পোরেশনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সুভাষ-চন্দ্রকে বিনাবিচারে এইরূপ কারারুদ্ধ করায় দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সরকারের এই নীতির প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা কর্পোরেশনের একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায়:শ্রীযুক্ত বসুর উপর কর্পোরেশনের কার্য্যভার অর্পণ করা হয় ও সরকারের কার্য্যের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কর্পোরেশনের এই সভায় মেয়র দেশবন্ধু দাশ বলিয়াছিলেন :—

"দেশপ্রেম যদি অপরাধ হয় তবে আমিও অপরাধী। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যদি অপরাধী হন, তবে আমিও অপরাধী—শুধু প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নহেন, এই কর্পোরেশনের মেয়রও সমদোষে দোষী।" এই কারারুদ্ধ অবস্থায় উত্তর-কলিকাতা নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়; বাঙ্গালার জনসাধারণ এইভাবে সরকারী দমননীতির যোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করেন এবং প্রকৃত দেশ-কর্ম্মীকে সম্মানিত করেন।

পাঁচ

মান্দালয়ে নির্জ্জন কারাবাসে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে; ঐ স্থানের অত্যাধিক গরম সুভাষচন্দ্রের মোঠেই সহ্য হইল না। রাত্রিতে তাঁহার মোটেই ঘুম হয় না। পিঠে তিনি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অজীর্ণ রোগে বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার শরীরের প্রায় ৪০ পাউণ্ড ওজন কমিয়া যায় এবং ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহাকে ইনসিন জেলে প্রেরণ করা হইল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়েন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতা ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসু ও সরকারী মেডিক্যাল অফিসার সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাঁহারা পরীক্ষার পর ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্রের অবস্থা বিশেষ শঙ্কাজনক। ইহাতে বাঙ্গালা সরকার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন এবং সরকার পক্ষ হইতে মিঃ মোবার্লী সুভাষচন্দ্রকে ইউরোপ যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিলেন। সুভাষচন্দ্রের নিকট এইরূপ সর্ত্ত দেওয়া হইল যে, তিনি কলিকাতা বা ভারতের অন্য কোন বন্দরে অপেক্ষা করিতে পারিবেন না—তাঁহাকে সরাসরি ইউরোপ যাত্রা করিতে হইবে। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ইনসিন

জেল হইতে সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন ঃ—

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল
৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

দাদা !

মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত তাহা জানিবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবারও সময় আসিয়াছে। আমার মতের সহিত আপনাদের মত মিলিবে কিনা জানি না ; তবু আমার মতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

আমি মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব বারবার আত সযত্নে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উচ্চারিত প্রতি শব্দ, প্রতি কথা বার বার করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি—একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনি অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার বক্তব্যে বাক্য-সংযোজনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সকল দিক দিয়া অতি ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন করিতেছি, ক্ষণিক ঝোকের বলে কোন নির্দ্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা বার বার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিম্বা আমার

তর্কনীতিতে যদি কিছু যোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্বিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মিঃ মোবার্লীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি। আমার মনে হয় তাঁহার ন্যায় আমিও যদি স্পষ্টাক্ষরে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে এবং আমার কর্ত্তব্যও যথাযথরূপে পালিত হইবে না। স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্ব্বদা বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাখুলি বলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার দর্শায়।

মিঃ মোবার্লীর কয়েকটি কথায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। তিনি যেখানে বালতেছেন যে আমার অতীত কার্য্যকাহিনী বা ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থার কোনও স্বীকারোক্তি চাহেন না—যেখানে তিনি বলিতেছেন যে আমি যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি বলিতেছেন যে তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার নিকট উপস্থিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে সকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে তিনি আমাকে আত্মসম্মানবিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাঁহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশ-

গুলি আ'ম উপলব্ধি করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরূপে আমি মাননীয় সভ্যের ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় কাউন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত করার নিদর্শন বোধ হয় ইহাই প্রথম। আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দূরীভূত করিতে চাই—ছোট দাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতামতের কোনই সম্পর্ক নাই; কারণ, তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূর্ব্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন কথা বা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূর্ব্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুইট্জার-ল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম। ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার পর যখন তিনি তাহা আমাকে জানাইলেন আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না—এবং পরে আমার এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোট দাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া, আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক ও

অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের ন্যায়ই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অনুমোদনের কিরূপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সরকারই বা এ অনুমোদনকে কিরূপভাবে রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোনও প্রয়োজন তাঁহার ছিল না ; তজ্জন্য আমিও তাঁহার এ কার্য্যের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার কয়েকজন রোগী সুইস্ স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে ; তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অন্যান্য যক্ষা-রোগীকেও যেরূপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান রোগী সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বাস ও শুশ্রূষার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনরূপে নিজেকে কোনও প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে যে, সরকার ছোটদাদার প্রদত্ত রোগবিবরণ গ্রহণ করেন নাই—যদিও তাঁহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জ্জনের উপায় গ্রহণ করিয়াছেন ; কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।' আমার জানিতে কৌতূহল হয়—সরকার কবে আমাকে 'অত্যধিক পীড়িত' বা 'একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন' মনে করিবেন ! যে দিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন আমার

রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, সেই দিন ? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগবিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহ্যতঃ তাঁহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন ? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে আমাকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইবে না বা বিদেশ যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে পাইব। তিনি এ কথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে যতদিন অর্ডিন্যান্স আইন থাকিবে ততদিন দেশে ফিরিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃতপক্ষে বলিয়াছেন যে, আমার পক্ষে যে দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিম্বা (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জনের চেষ্টা ও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই দুইয়ের মধ্যে অন্য কোনও মধ্যপন্থা অবশিষ্ট নাই ? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিন্যান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত—অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরও পুনরায় নূতন করিয়া চালানো হইবে না তাহা কে বলিতে পারে ? গত অক্টোবর মাসে সি-আই-ডি

পুলিশের কর্ত্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ হনে হয় না। ১৯২৯ সালে যদি এ অর্ডিন্যান্স আইনকে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয়, তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ীভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও এ প্রস্তাবে উল্লেখ থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ঝাকে ঝাকে যে সকল সি-আই-ডি বিচরণ করে, ভারত-সরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? একথা অস্বীকার করা যায় না যে আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত। যতদিন না মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুলিশ-গোয়েন্দা হইতেছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া জীবন দুর্বিবসহ করিয়া তুলিবে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে শুধু ব্রিটীশ গোয়েন্দা নাই, তথায় ব্রিটীশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সুইস্‌, ইটালীয়, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও

ভারতীয় গোয়েন্দা আছে, এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বৎসর মিঃ লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দাবিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপে অর্ডিন্যান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাহাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাঁহাদিগকে ভারতে ফিরিতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতের পার্লামেন্টের ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিশের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্ত-ভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন। আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্ত্তা বলিয়া রিপোর্ট

দিবেন। তাঁহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন কালে সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপে ইহা খুব সম্ভব যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা বলিয়া জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে; কারণ ইউরোপের লোক বর্ত্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকারপক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেণ্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিকদলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে প্যারিস্ হইতে লেনিনগ্রাড পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমার মনে সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনিলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বারবার মনে মনে ভাবিলাম —সত্যই কি আমি ভারতে ব্রিটীশ শাসনরক্ষার পক্ষে এতই

বিপজ্জনক যে, বাংলাদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াও সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, না—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি? যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেশীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন আমি আমার নিজ জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যেভাবে দেখিতেছেন, আমি প্রকৃতই সেরূপ নহি। আমি বাঙ্গালার বাহিরে কোন রাজনৈতিক কার্য্য করি নাই এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়া মনে করি না; কারণ বাঙ্গালাকেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ৬ বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বাঙ্গালার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে? সিংহল ত খাস ব্রিটীশ উপনিবেশ। ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা আইনানুসারে তথায় খাটিবে কিনা সন্দেহ।

বাঙ্গালা সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৫

খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত ১ বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম—প্রথম খুলনা জেলা কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয়, নদীয়া জেলার কাউন্সিল নির্ব্বাচনে একজন সভ্যপ্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাহিরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলিকাতার ঝাড়ুদারদিগের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে ১ মিনিটের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময়ে আমার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই যদি আমাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

মিষ্টার মোবার্লী একটি বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমি নির্ব্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি, আমার কোন আত্মীয়, এমন কি, পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি

নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসর কাল বিদেশে থাকিতে হইবে; সে সময়েও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই—কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়রা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহার প্রতি আমার স্নেহ-ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর কাল আমাকে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমিই কষ্ট পাইয়াছি—তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাখিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী, সরকারী কর্ম্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমাকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিল। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে আমি নির্দ্দোষ। আমার বিশ্বাস, পরলোকগত স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যার জন সাইমন

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন ? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাঙ্গালা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই। ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্গালা সরকার সেই আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে ৩ বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্ব্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ছিল, আমাকে সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া অন্ততঃ সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিবেন না ? ইউরোপে যতদিন হৃতস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কত দিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন ? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্ব্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগমুক্তির

পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবার্লী বলিয়াছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অর্ডিন্যান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবার্লীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিন্যান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে ৩ আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা লাফালাফি করুন না কেন বা শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় নামঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না, তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাই বড় করিয়া দেখি। বর্ত্তমান ঘটনার সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির

করিয়াছি—জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি—গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর পথে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হন। পিতামাতার কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেজন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্ব্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃত পাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের মনোবৃত্তি জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন—এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব। অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের শীঘ্র উত্তর দিবেন।”

এই সময় হইতেই সুভাষচন্দ্রের জীবনে নবতম ভাবের সূচনা হয়। কৈশোর হইতে যে অদম্য সাহস ও তেজস্বিতা তাঁহার জীবনকে আগাগোড়া বেগময় করিয়া রাখিয়াছিল, সেই তেজস্বিতার অন্তরালে সূচিত হইল দার্শনিক দৃষ্টি। সুভাষচন্দ্র জীবনকে আর এক নূতন ভঙ্গীতে দেখিলেন। জাতীয় জীবনে যে সংগ্রাম তাঁহার জীবনে প্রেরণাময় শক্তির সন্ধান জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সেই সংগ্রামের মূল খুঁজিতে গিয়া তিনি কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে ইনসিন জেল হইতে সুভাষচন্দ্র শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রখানিতে তাঁহার তদানীন্তন মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি লিখিয়াছিলেন—

"কারাগারে যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে হইতেছে যে, জীবন সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সঙ্ঘর্ষ—সত্য ও মিথ্যা ধারণার সঙ্ঘর্ষ। ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া কেহ কেহ অভিহিত করিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করে। এই সমস্ত ধারণা সক্রিয় ও সঙ্ঘর্ষাত্মক। হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরি বার্গসঁর Elan Vital-এর মতই এই সমস্ত ধারণা সক্রিয়। এই ধারণাসমূহ স্ব স্ব পথ সৃষ্টি করিয়া লইবে। আমরা মাটির পুতুল মাত্র। আমাদের মধ্যে

ভগবানের তেজোরাশির স্ফুলিঙ্গ নিবদ্ধ। এই ধারণার নিকট আমাদিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

ঐহিক এবং জড় দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপ আত্মনিবেদন যাহার পক্ষে সম্ভব, তাহার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমার আদর্শের জয় সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

গবর্ণমেন্টের সর্ত্তের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমার মতামত স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্টতর সর্ত্ত পাইবার জন্য আমি চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাদের এহেন নির্দ্দয়তায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। একটি আদর্শের উপরেই আমার ভিত্তি। জীবন আমার নিকট এত প্রিয় নয় যে, তজ্জন্য আমি চালাকির শরণ লইব। দৈহিক বা বৈষয়িক সুখের পরিমাপে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তি ও বৈষয়িক লাভের সংগ্রাম নহে। সেণ্ট পল বলিয়াছেন—

'আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না। পৃথিবীর অন্ধকারের নায়কদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম—উচ্চ-পদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম।' স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ। রাত্রির পর দিবা সমাগমের

ন্যায় আমাদের সকল চেষ্টাও অনুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইবে শরীর বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জয় অবধারিত।"

ছয়

সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় জেলে অবস্থান একটি ঘটনার জন্য বিশেষ স্মরণীয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত বসু ও অপর কয়েকজন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করেন। দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা ও অন্যান্য ধর্ম্মোৎসবের জন্য রাজবন্দীদিগকে কোন প্রকার ভাতা প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতিই এই ধর্ম্মঘটের একমাত্র কারণ। মান্দালয় জেলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য রাজবন্দীদের প্রতি সরকার যে ব্যবহার করেন, উঁহার প্রতিবাদ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করা হয়; দুঃখের বিষয় এই যে, প্রেসিডেণ্ট উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন না। রেঙ্গুনের নাগরিকগণ একটি জনসভা আহ্বান করিয়া অনশন ধর্ম্মঘটকারী রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের এক সভায় মান্দালয় জেলস্থ বাঙ্গালার

রাজবন্দীদের প্রতি সরকারের দুর্ব্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করা হয়। তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। ৪ঠা মার্চ্চ শ্রীযুক্ত বসু ও মান্দালয় জেলের অন্যান্য বন্দীরা অনশন ত্যাগ করেন।

অতঃপর আলমোড়া পাঠাইবার জন্য শ্রীযুক্ত বসুকে কলিকাতায় আনা হয়, তখন বাঙ্গালার গবর্ণরের গদীতে স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন সবেমাত্র অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ডাক্তারগণের পরামর্শে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে তিনি সুভাষচন্দ্রকে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য বিনাসর্ত্তে মুক্তিদান করেন।

মান্দালয় জেল হইতে তিনি যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পত্র দুইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র

মান্দালয় জেল

২।৫।২৫

"প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে 'double distillation'-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে ; কিন্তু এবার তা হয়নি এবং সেজন্যে খুবই সুখী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এ চিঠিখানাকে যে আবার "censor" এর হাত অতিক্রম করে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা; কেন না, এটা কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহ-গুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরেব প্রাচীর ও লৌহ দ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব করছি তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলো যে অকারণে বা কোন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জ্জিত রুচিকে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলো যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আমি বলতে পারি না যে জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেন না, সেটা নিছক ভণ্ডামী হয়ে পড়ে। আমি বরং আরো বলি যে কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস, একথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়—অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা

যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। একথা আমাকে বলতেই হবে যে এতগুলো জেলে বাস করার পর কারাশাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কারই আমার একটা কর্ত্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রণালীর) আদর্শের অনুকরণ মাত্র। ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে বরং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স-এর মত উন্নত দেশগুলোর ব্যবস্থাই অনুকরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটা সব চেয়ে বড় প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ, বা যদি বল, একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তি-গুলোকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধমূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারা-শাসনবিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

আমার মনে হয় না আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তাহলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ

আমাদের দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাক্‌ত তাহলে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত্ত ব্যেপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে দুঃখ-কষ্টের আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি; দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই—অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে। কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেরও কষ্ট এবং আত্মা প্রস্তুত থাক্‌লেও দেহ বা সময় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

৺ লোক্‌মান্য তিলক কারাবাসকালে গীতার সমালোচনা

করেন এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ।

এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে জেলের মধ্যে যে নির্জ্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জ্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলো তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছুচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত আজ যেন সেগুলো বেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আর কোন কারণে না হলেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'martyrdom' বলে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' ও 'proportion'এর জ্ঞান আছে (অন্ততঃ আশা করি বা আছে) এবং নিজকে 'martyr' বলে মনে করবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। স্পর্দ্ধা বা আত্মম্ভরিতা

জিনিসটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই—অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, তা শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন্। তাই martyrdom জিনিসটা আমার কাছে বড় জোর একটা আদর্শই হতে পারে।

আমার বিশ্বাস, বেশী দিনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকাল বার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে ; সুতরাং এদিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পার না কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্যে দায়ী—যথা খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফুর্ত্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটা অধীনতার শৃঙ্খলভার, বন্ধুজনের অভাব এবং সঙ্গীতের অভাব যাহা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হলেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলো অভাব আছে যা মানুষ ভেতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলো আছে যেগুলো বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল বার্দ্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্যে সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্, বিশ্রান্তালাপ, সঙ্গীতচর্চ্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধূলা করা, মনোমত কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের

জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে সে আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না; যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দী করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিনোদনের বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলো আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়ে থাকবে।

একথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে আপনার নিজের লোকের, বন্ধু-বান্ধবের এবং সর্ব্ব-সাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্ম-ভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ করে নেবে; কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yardএ যে সমস্ত কয়েদীদের কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে তাদের নিজের লোকেরা জানেই

না যে সে জেলে বন্দী, লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয়নি—এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্যসমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি; কিং একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার যদি বেশী শক্তি ও উদ্যম থাকত তাহলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্য আমার নাই।

আমাদের জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার বা অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কমে আসে সেখানে বন্দীজীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্মধরণের আঘাত উপর হতেই আসে, জেলের কর্ত্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে দেয়; সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আদর্শ আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে—আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে তুলে

দেখিয়ে দেয় যে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমিই বলেছ যে মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটীকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে,—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোটখাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না বরং আমার মনে হয় দুঃখ যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর বিনা দুঃখ কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে একথা বলা অনাবশ্যক যে আরও বই সাদরে গৃহীত হবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্র ঃ—

মান্দালয় জেল

১২।৮।২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার 'স্মৃতিকথা' পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার অন্তর্দৃষ্টি, দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা,—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্‌কা করেছেন। বাস্তবিক 'পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকেদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করিতে হয়।' এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তাঁর অনুগ্রহ কর্ম্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝ্‌ছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগল 'একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই; পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না।' বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে, তা' হ'লে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে।· ···'আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।' প্রকৃত-পক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মত-নির্বিবশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্যচরিত্র বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সব চেয়ে বেশী ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যত বড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো—মার (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায়—'রাগ করিবার, অভিমান করিবার যায়গাও আজ আমাদের ঘুচিয়া গেছে।'

আপনি এক যায়গায় লিখেছেন "লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই; অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি-গালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সে দিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্দ্ধসত্যে বাঙ্গলার সব খবর-কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য-ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক

ধ'রত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়টী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ব্বগৌরব ফিরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল ক'রল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থ-সঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর-কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা' বাহিরের লোকে জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্ম্মভার—এই দুইয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য ক'রতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে তাঁর স্বদেশ-সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খৃঃ ধরপাকড়ের সময়ে তিনি স্থিরসঙ্কল্প করেছিলেন যে একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি

পারবেন না—এরকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরেরই বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন; তাই আমরা বলেছিলুম যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্ত্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধ'রে তর্কবিতর্ক চলে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারি নি। শেষে তিনি বলেন—'এটা আমার আদেশ—পালন করতে হবে।' তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে তিনি পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা; তাঁকে পাঠান উচিত কিনা সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল। তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা; কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত না। কারণ একেই তিনি অসুস্থ তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষ সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব্বপ্রথমে ভোম্বল যাবে, তারপর বাসন্তী দেবী ও ঊর্ম্মিলা দেবী যাবেন এবং তাঁর ডাক যে-মুহূর্ত্তে আসবে—তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে, তার সন্ধান কয়জন রাখে ? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নিয়ে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে।

আমার মনে হয়, মহাপুরুষদের মহত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বসুমতী'তে আমি দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ও অনুগত কর্ম্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তি-তেই পরিপূর্ণ। কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা' বলতে পারি না।............দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্ম্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা এবং তাঁর অনুচরবর্গ কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা' হ'লে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হ'ত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর

উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে, কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকল্‌মা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমার কেন এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা: আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটা প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হ'তে পারে না—অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপান যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়বে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া

যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে, তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয় বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও, তার মধ্যে একটা সুখ একটা শান্তি একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাংলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

'সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

যখন ক্ষণেকের তরে বাংলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে, তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে!

কেন এ পত্র লিখে ফেল্‌লুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব একথা আগে কখনও মনে আসেনি। তবে আপনার লেখা

পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসাতে লিপিবদ্ধ করলুম। আর যখন লিখেই ফেলেছি তখন পাঠিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখি না ; যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

সাত

বিলাতে পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারের নিকট সুভাষচন্দ্র যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি প্রদত্ত হইল ঃ—

Fitz William Hall.
Cambridge.
12/11/19

যাহাদিগের নিকট হইতে পত্র আশা করিতে পারি নাই তাহারা পত্র দিয়াছে—অথচ তোমার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না। যাহা হউক, আশা করি ভবিষ্যতে পত্র দিবে।

শেষ পত্রে তোমাকে লিখিয়াছিলাম যে আমি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছি এবং সেখানে আসিয়াছি। জনৈক বন্ধুর সাহায্যে—কতকটা বি-এর result-এর দরুণ এবং কতকটা

I. D. F. Serviceএর দরুণ স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি থাকিবার স্থানের অভাবসত্ত্বেও সৌভাগ্যবশতঃ বাসস্থান পাইয়াছি।

আমার মতলব আগামী বৎসরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষ দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি—১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos-এর পরীক্ষা দেওয়া। এখানকার Degree আমাকে লইতে হইবেই—কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।

এখানে ভারতবাসীদের একটা সমিতি আছে—নাম 'Indian Majlis'—সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বক্তারা আসেন। Mrs. Sarojini Naidu একবার বক্তৃতা করিয়াছেন—'Kingdom of Youth' সম্বন্ধে গতবার W. W. Pearson বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমার আসিবার পূর্ব্বে তিলক মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন; ইণ্ডিয় অফিস চেষ্টা করিয়াছিল বাধা দিতে—কিন্তু পারে নাই এখানকার ভারতবাসীদের সুরটা বড় চড়া এবং তাঁহার নরম বক্তৃতা শুনিয়া সকলে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল।

গত দুই দিন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, এখানকার জলবায়ু লোককে উদ্যম-শালী করিয়া তোলে। এখানকার activity দেখে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক সময়ের ভিতরে সময়-জ্ঞানটা ভাল

আছে এবং সব কাজে method আছে। আমার সব চেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা চামড়া আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে।

এখানকার ছাত্রদের একটা status আছে এবং Professor-দের ব্যবহার অন্য রকম। মানুষের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তায় ভিখারী দেখিতে পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে অনেক দোষ আছে—কিন্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণাবলী দেখে মাথা নত হয়। ইতি—

Cambridge
19/1/20

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। আমার মনে হয় তুমি এক সঙ্গে বড় বেশী কাজ হাতে নিয়েছ। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ যে যাহারা কোন কাজ করে না, তাহারা কিছুই করে না—আর যাহারা করে তাহারা বড় বেশী করিতে চেষ্টা করে এবং এক দিনের ভিতরে সব কাজ করিতে গিয়া শরীর ও সব হারাইয়া বসে। মানুষ যদি কোন স্থায়ী কাজ করিতে বাসনা করে তাহা হইলে তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—২।১ বৎসরে তাহা সম্ভব নয়। অতএব দেশের জন্য কোন স্থায়ী কাজ করিতে যদি তোমার

কোন বাসনা থাকে তবে এরূপভাবে কাজ করা উচিত, যাহাতে বহু বৎসর ধরিয়া কাজ করিবার শক্তি থাকিবে। অবশ্য কোন্ দিন কাহার যাবার ডাক আসিবে কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু তা ব'লে আগে থেকে গলায় ছুরী দিয়ে কোন লাভ নাই বা অতিশয় পরিশ্রম করে শরীর নষ্ট করেও কোন লাভ নাই।

এদেশের 'নেটিভ'দের কতগুলি গুণ আছে, যার জন্য তাহারা এত বড় হইতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ এরা ঘড়ির মত ঠিক সময়ে সব কাজ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এদের একটা robust optimism আছে। আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশী ভাবি, এরা জীবনের সুখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে। তারপর এদের strong common sense আছে এবং নিজেদের জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল বোঝে। এখন মোটের উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের জলবায়ুর দোষ। আমাদের দেশের হাওয়াটা বদলাতে হবে।

তোমার শরীরের অযত্নের প্রধান কারণ দাঁড়িয়েছে—ঐ প্রাচ্য দেশের ঔদাসীন্য। 'কি হবে শরীরের যত্ন নিয়ে—দুদিনের শরীর দুদিন পরে মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে।' এরূপ ঔদাসীন্য দেশসেবকের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তোমার একটু প্রতীচ্যের হাওয়া দরকার। তোমার motto এখন হওয়া উচিত 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' শরীরের অযত্ন করা একটা অপরাধ; সে অপরাধ—শুধু নিজের কাছে নয় পাঁচজনের কাছে

এবং সর্ব্বোপরি দেশের কাছে। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের শারীরিক সামর্থ্য যদি অল্পবয়সে নষ্ট হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাহাদের আদর্শের ভিতরে একটা গলদ বা সঙ্কীর্ণতা রয়ে গেছে। প্রত্যেকে মনে করবে—তোমার শরীর তোমার নয়, তুমি trustee মাত্র !

এখনও বুঝিতে পারি নাই আমি আদর্শ ভ্রষ্ট হয়েছি কি না। আমি আত্মপ্রতারণা ক'রে নিজকে বুঝাতে চাই না যে Civil Serviceএর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিসটাকে ঘৃণা করতাম, এখনও বোধ হয় করি। এ অবস্থায় Civil Service-এর জন্য চেষ্টা করা দুর্ব্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবর্ত্তী মঙ্গলের সূচক, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন।

অনেক ঘটনার শেষে এসে না পৌঁছালে তার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমার সম্বন্ধেও কি তা হতে পারে না ? ইতি——

Cambridge.
2. 3. 20.

কয়েক মেল হইল তোমার কোন পত্র পাই নাই বা তোমাকে পত্র দেই নাই। যখন সময় কম থাকে, তখন শুধু তাদেরই লেখা হয়, যাদের দুলাইনে লেখা যেতে পারে।

সেদিন 'ভারতীয় মজলিস'-এর বাৎসরিক ভোজ হয়ে গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি (guest) হয়ে এসেছিলেন, এখানকার বিদেশীয় বন্ধুগণও কেহ কেহ এসেছিলেন। লণ্ডন থেকে কয়েক জন ভারতীয় মহিলাও এসেছিলেন। মিসেস রায় গত রবিবারের মজলিসের সভায় Rights of the Indian mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

বাস্তবিক কবে আবার ভারত-রমণীবৃন্দ সমাজের শিক্ষাদাত্রীরূপে আসন গ্রহণ করিবেন। না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগিবে না। যে দিন Mrs Sarojini Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেদিন আনন্দে বুক দশ হাত ফুলে উঠেছিল, সেদিন দেখিলাম ভারত রমণীর আজও এমন শিক্ষা, দীক্ষা, গুণ ও চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন।

লণ্ডনে মিসেস মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়। দেখিলাম মিঃ মিত্র moderate in politics, কিন্তু মিসেস মিত্র extremist — আনন্দে বুক ভরে গেল। মিসেস ধরও extremist. এসব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চ, সে দেশের উন্নতি না হ'য়ে পারে না। এ দেশে যে সকল ভারত-মহিলা আসেন, আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে গভীর স্বদেশ-প্রেমের উদ্রেক হয়—কারণ মাতৃ হৃদয় বড় কোমল ও বড় গভীর।

জগদীশ বাবু F. R. S. হয়েছেন শুনছি। তাঁহাকে labour leaderরা বলোছলেন—'the country which can tolerate Amritsar massacres deserves it.' Horniman বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। তিনি তাঁর 'land of adoption'-এ ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। Passage পাচ্ছেন না।

ইতি—

আট

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য শ্রীযুক্ত বসুকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি যখন কারাগারে ছিলেন তখন কলিকাতা কর্পোরেশন কয়েকবার (১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে পর্য্যন্ত) তাঁহার ছুটী মঞ্জুর করেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ছুটীর কাল ফুরাইয়া গেলে এবং তাঁহার স্থলে মিঃ জে, সি মুখার্জ্জিকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করার পরে ১৫ই মে তারিখে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান

কর্ম্মকর্ত্তারূপে স্বল্প কার্য্যকালের মধ্যেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তির ব্যাপার বেশ একটু রহস্যপূর্ণ। প্রথমতঃ আদেশ দেওয়া হয় যে, তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য আলমোড়াতে প্রেরণ করা হউক। বস্তুতঃ, তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। রোগশয্যা হইতে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর নিকট এক বাণী প্রচার করেন। তাহাতে তিনি বলেন—"এখন আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমার মনে হয়—যাহাতে আমি শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি তজ্জন্য এখন আমার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইবে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা। দীর্ঘকাল আমি কারাবাসে ছিলাম। আমার সহিত যাঁহারা কারাভোগ করিতেছেন তাঁহাদের চিন্তা আমার মনে দিবারাত্র উদিত হইবে। আমি আশা করি, আমি দ্রুত নিরাময় হইয়া উঠি আমার দেশবাসী ইহাই কামনা করিবেন; কারণ তাহা হইলে আমি আমাদের সকলের অভীষ্ট কার্য্যে পুনরায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারিব।" কিন্তু বিশ্রাম করা তাঁহার হইয়া উঠিল না। অন্তরে যাহার কর্ম্মোন্মাদনা, দেহ তাহার বিশ্রাম করিবে কি করিয়া? কিছুদিন পরে পাটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের অসুস্থ থাকা সাজে না।" তিনি পুনরায় কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তি-সংবাদে সমগ্র বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ কলিকাতা সহর আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্রের মুক্তি-সংবাদ পাইবামাত্র কলিকাতা কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়; এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তা ও ব্যবসাকেন্দ্রের দোকান-পাটও বন্ধ হইয়া যায়। মুক্তির আনন্দে দেশবাসী অধীর হইয়া উঠেন। বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তাঁহার মুক্তি সংবাদ পৌঁছিলে, কংগ্রেস সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই উচ্ছ্বসিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার আরোগ্য কামনা করেন। তাঁহার মুক্তিতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত আনন্দসূচক পত্র আসিতেছিল তদুত্তরে তিনি নিম্নলিখিত নিবেদন প্রচার করেন :—

"আমার কারামুক্তির পর হইতে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে নানা ভাবের সমবেদনা-সূচক ও আনন্দজ্ঞাপক অসংখ্য সংবাদ পাইতেছি। ধনী-দরিদ্র-বালক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকল স্থানের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের এরূপ আকুল অভ্যর্থনা এবং আমার রোগমুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনায়, আমি শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে, এতই অভিভূত ছিলাম যে এতদিন এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সময়ের দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দলের

লোকই আমাকে আমার হৃতস্বাস্থ্য অর্জ্জনের প্রার্থনা করিয়া যে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করিতেছি। আমার স্বাস্থ্যচিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া বাঙ্গালার বহুগৃহে ভগবৎচরণে যে প্রার্থনা জানানো হইতেছে, তাহাতেও আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমানে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য, তাহাতে পৃথকভাবে প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আশা করি, আমি একটু সবল হইলেই তাহা পারিব। আমার চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিবার কিম্বা শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি সাধন করিবার ব্যবস্থা আসিয়াছে। যাঁহারা এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষার প্রতি আমার শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি; কিন্তু বর্ত্তমানে আমার এক ধারানুযায়ী চিকিৎসা চলিতেছে, সুতরাং সকলেই স্বীকার করিবেন যে এই ধারায় পূর্ণ পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও পরিবর্ত্তন সাধন উচিত হইবে না। আমি সকল পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছি এবং যতটুকু সম্ভব তাহার প্রয়োগও করিতেছি।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর আমার কারাবরণের পর হইতে এবং বিশেষতঃ মান্দালয় জেলে অধিবাসের পর আমার স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হওয়ায় অধিকাংশ অধিবাসী যেরূপভাবে আমার হিতচিন্তা করিতেছেন, তাহা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল বাহিরে আমাকে বন্দী করিয়া রাখিবার পরও বাঙ্গালার চিরশ্যামল তটে পুনরায় উপস্থিত হইলে দেশবাসিগণ পূর্ণ উৎসাহে আমাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা আমার অজ্ঞাত রাখিবার বহুবিধ চেষ্টা করা সত্ত্বেও, আমি তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি। জনসাধারণের সেবাকার্য্য পুনরারম্ভ করিলে দেশবাসিগণ আমাকে কিরূপ আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিবেন তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি।

সম্মুখে অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম ও অবসরের যে সময় রহিয়াছে সে সময় আমি অহর্নিশি ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই করিব যে দেশবাসী আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্পণ করিয়াছেন—আমি যেন কিয়দংশেও তাহার যোগ্য হইতে পারি। এখন আমার প্রধান কাজ হইবে—আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে, তাহার সমাধানকল্পে আমি যেন নিভৃতে প্রস্তুত হইতে পারি।

চতুর্দ্দিকেই নবজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। পূজনীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের পর যে ঘনান্ধকার আমাদিগকে আবৃত করিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ অপসারিত হইতেছে—যাহা এখনও আছে, তাহার মধ্যেও নবপ্রভাতের নবীন সূর্য্যের অরুণ আভা দেখা যাইতেছে।

সময় নিকট হইলে, কর্ম্মের আহ্বান আসিলে, যেন আমরা

সকলেই একাগ্রচিত্তে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি আজ ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।”

নয়

তারপর আরম্ভ হইল দেশব্যাপী সাইমন কমিশন বয়কটের আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালাদেশে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন পূর্ণ উত্তমে চালাইতে লাগিলেন। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন বোম্বাইতে পৌঁছেন। ঐদিন সমগ্র ভারতে “সাইমন, ফিরিয়া যাও” বলিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বাঙ্গালার ছাত্রগণ ঐদিন স্বেচ্ছায় স্কুল-কলেজে অনুপস্থিত থাকে। ছাত্র ও যুবকদিগকে সুভাষচন্দ্র চিরকালই ভালবাসেন; তিনি তাহাদের কাজে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং সুস্পষ্ট কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিয়া তাহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করেন।

১৯২৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র পুনাতে মহারাষ্ট্র প্রদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সময় দুই দিন তিনি সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত অবস্থান করেন। তিনি সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন ইহার পর বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি স্বেচ্ছাসেবক

আন্দোলন আরম্ভ করেন। নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন, তাহার কর্ম্মকুশলতা ছিল অনন্যসাধারণ। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ত্রিচত্বারিংশ অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জেনারেল কমাণ্ডিং অফিসাররূপে জাতীয় মহাসভার নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে বিরাট সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধিত করেন। এই উপলক্ষে যে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল, ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ইহার তুলনা বিরল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও অপূর্ব্ব আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়।

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর আপোষরফামূলক প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন—"এই প্রস্তাবের অর্থ এই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি নেহেরু কমিটি রচিত শাসনতন্ত্র ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে মানিয়া লন, তাহা হইলে কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিবে এবং তদ্বারা উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নির্দ্দিষ্টরূপে মানিয়া লইবে। কিন্তু আমরা কখনও সেই অবস্থা মানিয়া লইতে পারি না। 'স্বাধীনতা' আমরা চাই—এ 'স্বাধীনতা' আমাদের সুদূর ভবিষ্যতের আদর্শ নহে—'স্বাধীনতা' বর্ত্তমানেই আমাদের দাবী।" তিনি যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন

করেন তাহা এই—"কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতীয় জনগণের আদর্শ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কংগ্রেস সেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটীশের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব।"

সংশোধন প্রস্তাবটী উত্থাপন করিতে গিয়া সুভাষচন্দ্র বলেন—"হয়ত আপনারা বলিবেন যে স্বাধীনতার এই প্রস্তাব করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে আমি বলিব, ইহা দ্বারা আমাদের এক নূতন মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ কি? আমাদের বর্ত্তমান মনোবৃত্তিই উহার কারণ। এই দাস-মনোবৃত্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন যদি আপনাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আদর্শ দেশবাসীর মনে সঞ্চার করিতে হইবে। যদি ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় যে, আমরা কার্য্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করিব না সত্য, কিন্তু দেশবাসীর নিকট অকপটভাবে এই আদর্শ প্রচার করিব—তাহা হইলে আমরা এক নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তরুণ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিব। আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমরা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব না। দেশের তরুণেরা তাহাদের দায়িত্ব বুঝিয়াছে, কাজের জন্যও প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের কর্ম্মপন্থা আমরা নিজেরা স্থির করিব এবং যাহাতে আমাদের

প্রস্তাব উপেক্ষাভরে আবর্জ্জনাপাত্রে নিক্ষিপ্ত না হয়, তজ্জন্য আমরা যথাশক্তি ঐ কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া কাজ করিব।—আপনারা ইহা নিশ্চয়ই মানেন যে, বাঙ্গালাদেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হইতেই আমরা স্বাধীনতা অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝিয়াছি। উহার অর্থ আমরা কখনও উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বুঝি নাই। আমাদের দেশের শত শত শহিদের আত্মবিসর্জ্জনে—কবির বাণীতে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতারই রূপ দেখিয়াছি। উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথায় আমাদের দেশবাসীর অন্তঃকরণে—তরুণদের মনে এতটুকু সাড়ারও সৃষ্টি করিবে না। আজ তরুণদের কথাই বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে—ইহারাই দেশের ভবিষ্যৎ।" সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবটী ১৩৫০—৯৭৩ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

জাতীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হিন্দুস্থান সেবাদল সম্মেলন হয়। সুভাষচন্দ্র ইহার সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন—পৃথিবীর সকল দেশের 'স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী'ই জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত; আমাদের এই ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

ইহার অব্যবহিত পরে সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু,

ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী নেতৃবর্গের সহযোগিতায় 'স্বাধীনতা সঙ্ঘ' গঠন করেন। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা এই সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য সুভাষচন্দ্র উক্ত সঙ্ঘের বাঙ্গালাদেশের শাখার কাজের জন্য একটা সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা স্থির করেন। পরে অন্যান্য প্রদেশেও ঐ কর্ম্মপন্থাই গৃহীত হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদল সম্মেলনেরও (নেহেরু কমিটি) একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দশ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালার গবর্ণর হঠাৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে সকলের মনে হইল যে তিনি স্বরাজ্যদলকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিলেন। সুভাষচন্দ্র ঐকান্তিক দৃঢ়তার

সহিত এই আহ্বান গ্রহণ করিলেন। ১৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যে নির্ব্বাচন হইল তাহাতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইলেন। বহুস্থানে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র 'নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস' পালন উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবর্গ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা (রাজদ্রোহ) অনুসারে অভিযুক্ত হন। তিনি তখন পাঞ্জাব ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির করা হইল। পাঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুভাষচন্দ্র আলীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইলেন; মামলার বিচারসাপক্ষে তাঁহাকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেওয়া হইল।

১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন্দ্রনাথ দাস লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ৬৩ দিন অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই নিদারুণ সংবাদে সমগ্র দেশ বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনীত হইলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এক বিরাট শবযাত্রা বাহির হয়। দেশবন্ধুর শবযাত্রা ভিন্ন এতবড় শবযাত্রা আর দেখা যায় নাই।

ঐ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র হাওড়া রাষ্ট্রীয়

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ইহার পর অক্টোবর মাসের ১৭ই তারিখে তিনি লাহোর রওনা হন এবং ১৯শে তারিখে পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে পৌরহিত্য করেন। লাহোরে তাঁহাকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেই সম্মেলনে তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন ঃ—

"তবে জগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আমাদিগকে এমন একটা আদর্শকে চোখের সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহা বিদ্যুতের মত আমাদের শক্তিকে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। সে আদর্শ— স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ সকলে সমান বুঝেন না। আমাদের দেশেও স্বাধীনতার অর্থের একটা ক্রমপরিবর্ত্তন হইতেছে। স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি—সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রাত্রির পর দিন যেমন আসিবে সে রকম ইহাও আসিবে। ভারতবর্ষকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন শক্তি পৃথিবীতে আজ নাই।"

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর অমরাবতীতে তিনি মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সেই সম্মেলনে তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন—'যে সমাজ গড়িয়া তুলিতে আজ আমরা বদ্ধপরিকর, তাহার গোড়ার কথা হইবে—সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ধন-ঐশ্বর্য্যের উপর সকলের

সমান অধিকার, বৈষম্যমূলক সামাজিক বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ-প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি।”

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ৪৪তম অধিবেশন হয়। তাহাতে সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী একটা প্রস্তাব আনয়ন করেন। পূর্ণ স্বাধীনতাই স্বরাজের অর্থ বলিয়া ঘোষণা করিতে কংগ্রেসকে তিনি অনুরোধ করেন এবং আইন সভাসমূহ বর্জ্জনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া মহাত্মাজীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ব্র্যাড্‌লে হলে লাহোরের নাগরিকদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। লাহোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানের পদ ত্যাগ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবসের শোভাযাত্রা সম্পর্কে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। তিনি তখনও কারাগারে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণে বাহির হন। মালদহ জেলার সীমান্তে ট্রেনের কামরায় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এক আদেশ তাঁহার উপর জারী করা হয়। ঐ আদেশে তাঁহাকে মালদহ জেলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়। সুভাষচন্দ্র ঐ আদেশ মানিতে অস্বীকৃত হইলে ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের বিশ্রামাগারেই তাঁহার বিচার করা হয়। তাঁহার কিছু বলিবার আছে কিনা আদালত তাহা জানিতে চাহিলে সুভাষচন্দ্র বলেন—“এই আদেশে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার সম্পূর্ণ অপব্যবহার করা হইয়াছে। আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন ভারতবাসী হিসাবে আমি ইহা মানিতে পারি না। আমি যদি ঐ আদেশ মানিয়া লই, তাহা হইলে নাগরিক হিসাবে আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব।” বিচারে তাঁহার ৭ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং তাঁহাকে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরণের আদেশ

দেওয়া হয়। যাহাতে শোভাযাত্রাদি না হয়, তজ্জন্য ১৮ই জানুয়ারী রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে রাজসাহী হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী নাটোর রেলওয়ে ষ্টেশনে আনিয়া উঠাইয়া দেন। তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করায় তিনি গ্রেপ্তার হন। ময়দানের নিকট শোভাযাত্রা উপস্থিত হইলে পুলিশ উহার উপর বেপরোয়া লাঠি চালনা করে। উহার ফলে সুভাষচন্দ্র আহত হন। বিচারে তাঁহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই সময় গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পন্ন হয়। সুভাষচন্দ্র এই চুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৪ই মার্চ্চ তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বোম্বাই অভিমুখে রওনা হন। সেখান হইতে ১৮ই মার্চ্চ তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২০শে মার্চ্চ করাচীতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে যোগদান, নিখিল ভারত নব-জোয়ান সম্মেলন ও নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি যাত্রা করেন। করাচী কংগ্রেসে তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থীদের মনোভাব বিবৃত করিয়া গান্ধী-

আরউইন চুক্তি সম্পর্কে অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। সামযিক অবস্থা বিবেচনায় কংগ্রেসে বিভেদ স্থষ্টি না করিবার অনুরোধ জানাইয়া তিনি এক বিবৃতি প্রদান করেন।

হিজলী বন্দীশালায় গুলি চালনার ফলে দুইজন রাজবন্দী নিহত ও বহু রাজবন্দী আহত হওয়ার সংবাদ পাইয়া সুভাষচন্দ্র ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানের পদ ত্যাগ করেন। অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্রের উপর দুইবার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশ জারী হয়। একবার ব্যারাকপুরের সন্নিকট শ্রমিক সম্মেলন উপলক্ষে এবং তৎপর ঢাকার ঘটনা সম্পর্কে বে-সরকারী তদন্ত কমিটির সভ্যরূপে তদন্ত করিতে যাইবার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়; পরে তাঁহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। ব্যারাকপুরের ব্যাপার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে বলেন—সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখা হইয়াছিল মাত্র, গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

হিজলী জেলের দুর্ঘটনায় এবং গোয়েন্দা কর্ম্মচারী মিঃ

আসানুল্লার হত্যার পর চট্টগ্রামে পুলিশের জুলুমের সংবাদে বাঙ্গালার রাজনৈতিক অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। বাঙ্গালা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি 'পৌর অধিকার রক্ষা সমিতি' নামে একটী সমিতি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

বিলাতের গোল-টেবিল-বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্ত্তনের পর বোম্বাইয়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হয়, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র ২০শে ডিসেম্বর তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হন। সুভাষচন্দ্র বোম্বাই গমন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত বাঙ্গালার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও যোগদান করেন। এই স্থলে বলা প্রয়োজন যে তিনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ লর্ড আরউইনের বিবৃতির উত্তরে ভারতের উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পরিকল্পনা রচনায় সহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়া যে বিবৃতি প্রচার করেন, সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ কিচলু তাহাতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হন। সুভাষচন্দ্র বলেন যে, ঐ বিবৃতি কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন; তৎপর

মতভেদের কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সুভাষচন্দ্র ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী বোম্বাই হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী কল্যান ষ্টেশনে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়া মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত সিউনী সাবজেলে নীত হন। সিউনী জেলে কয়েক মাস রাখিবার পর তাঁহাকে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে, সেখান হইতে ভাওয়ালী স্বাস্থ্যাবাসে এবং তথা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বলরামপুর হাসপাতালে (লক্ষ্ণৌ) স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট অবশেষে বহু বিবেচনার পর তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাইতে সম্মতি দেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি ১লা জানুয়ারী জাহাজ হইতে এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী প্রেরণ করেন,—"বাঙ্গালা মরিলে কে বাঁচিয়া থাকিবে? বাঙ্গালা বাঁচিলে কে মরিবে?"

তের

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ ভিয়েনায় পৌঁছেন। তিনি স্বাস্থ্যবাস কার্থে-এ অবস্থান করেন। ভিয়েনাতে প্রবীন

রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত মিঃ বিঠলভাই প্যাটেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মিঃ প্যাটেলও চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গিয়াছিলেন; ইহার পর তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত অবস্থান করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাই প্যাটেল মহাত্মা গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার প্রতিবাদ করিয়া সম্মিলিতভাবে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ তিন বৎসর সুভাষচন্দ্র ইউরোপে ছিলেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার পিতা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা শঙ্কাজনক হইয়া পড়ে। বহু আবেদন-নিবেদনের পর ভারত সরকার তাঁহাকে ভারতে আসিবার অনুমতি দেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি তাঁহার পিতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখিবার জন্য ভারতে আগমন করেন। কিন্তু পিতাকে জীবিত অবস্থায় দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইল না। ২রা ডিসেম্বর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ৩রা ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে করাচী পৌঁছিলে শ্রীযুক্ত জামসেদ মেটার নিকট পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। বিমান হইতে করাচী অবতরণ করিবামাত্রই শুল্ক বিভাগের একজন

কর্ম্মচারী ও একজন গোয়েন্দা তাঁহার মালপত্র খানাতল্লাস করেন এবং তাঁহার "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" নামক গ্রন্থের একখানি টাইপ করা কপি লইয়া যান। সেখান হইতে সুভাষচন্দ্র বিমানযোগেই কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দমদম বিমানঘাঁটিতে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে সরাসরি এলগিন রোডের বাড়ীতে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার উপর এক আদেশ দেওয়া হয়; বস্তুতঃ তাঁহাকে স্বগৃহে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। সাত দিনের মধ্যে দেশত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া তাঁহার উপর আর একটা আদেশ জারী করা হইয়াছিল; কিন্তু পরে তাঁহাকে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্য্যন্ত ভারতে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন।

চৌদ্দ

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইউরোপে পৌঁছিবার পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহাকে অনেকটা নির্ব্বাসিতের মত জীবন যাপন করিতে হয়। ইংলণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাইবার অনুমতি তাঁহার ছিল না। লণ্ডনস্থ ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমিতির উদ্যোগে লণ্ডনে যে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা ছিল তাহাতে

সুভাষচন্দ্রকে সভাপতিত্ব করিতে আহ্বান করা হয়। কিন্তু লণ্ডনে যাইবার অনুমতি না থাকায় তাঁহার পক্ষে অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার লিখিত অভিভাষণ সম্মেলনে পাঠ করা হয়। সমুদ্র-শুল্ক-আইন অনুসারে ঐ অভিভাষণ ভারতে প্রেরণ নিষিদ্ধ হয়। তাঁহার "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" নামক গ্রন্থ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইলে বহু মনীষী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রন্থখানি সম্প্রতি ভারতে আনয়নের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

পিতৃশ্রাদ্ধের পর ইউরোপে ফিরিয়া গেলে বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ ড্যামিয়েল তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করেন। তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হয়। এই সময়ে তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একখানি ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন উহা শেষ করিতে পারেন নাই। ৬ই জুন তিনি ভিয়েনাতে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ইউরোপীয়ান সোসাইটীর সম্মেলনে যোগদান করেন। ডিসেম্বর মাসে রোমে এসিয়াবাসী ছাত্রদের যে সম্মেলন হয়, তিনি তাহাতেও যোগ দেন। সিনর মুসোলিনী ঐ সম্মেলনের উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের তৃতীয় সম্মেলনেও (Third Convention) সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আয়র্লণ্ডে গমন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রাক্কালে তিনি ভারতে ফিরিয়া

আসিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলে তাঁহাকে জানান হয় যে, তিনি স্বাধীনভাবে ভারতে ফিরিতে পারিবেন না। তিনি এই সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়াই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৮ই এপ্রিল 'কন্টিভার্ড' জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবামাত্র সুভাষচন্দ্রকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া আর্থার রোড ফাঁড়িতে লইয়া গিয়া আটক রাখা হয়। ১৩ই এপ্রিল তাঁহাকে আর্থার রোড জেল হইতে পুনার যারবেদা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১০শে মে তিনি যারবেদা জেল হইতে কার্শিয়াং-এর গির্দ্দা পাহাড়ে শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর বাড়ীতে অন্তরীত হন। সেখান হইতে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ১৭ই ডিসেম্বর দার্জ্জিলিং মেলযোগে কলিকাতা আনিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে ভারতব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১০ই মে তাঁহার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 'নিখিল ভারত সুভাষ দিবস' প্রতিপালিত হয়।

পনর

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল বন্দী-জীবনের পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ বুধবার সন্ধ্যায় ভারত সরকার সুভাষচন্দ্রকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেন। তিনি প্রায় একমাস কাল কলিকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে থাকেন। ২৫শে এপ্রিল

তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাঞ্জাবের ডালহৌসী নামক স্থানে যাত্রা করেন। কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে বাঙ্গালার কংগ্রেসী দলাদলি মিটাইয়া ফেলিবার জন্য তিনি এক মর্ম্মস্পর্শী আবেদন প্রকাশ করেন। পাঁচ মাস ডালহৌসীর ডাঃ ধরমবীরের গৃহে অবস্থানের পর ৭ই অক্টোবর সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হয়। কিন্তু ডাঃ ধরমবীর পরামর্শ দেন যে, কোনও স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাঁহার পক্ষে আরও কিছুকাল বিশ্রাম প্রয়োজন—নতুবা পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করা অসম্ভব হইবে। এই পরামর্শানুযায়ী সুভাষচন্দ্র ৯ই অক্টোবর কার্শিয়াং যাত্রা করেন এবং দিন পনর তথায় অবস্থানের পর ২৪শে অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সম্পর্কে উদ্যোগ-আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর সুভাষচন্দ্র স্বাস্থ্যলাভের জন্য পুনরায় বিমানযোগে ইউরোপ যাত্রা করেন। অষ্ট্রিয়ার বাদ-গাস্তিনে তিনি প্রায় ছয় সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং ভালরূপে চিকিৎসা করান। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তিনি ইংলণ্ড পৌঁছেন। লণ্ডনে তাঁহাকে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে পার্লামেন্টের বহু বিশিষ্ট সদস্যের সঙ্গে তিনি ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং আয়র্লণ্ডের কর্ণধার মিঃ ডি' ভ্যালেরার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র হরিপুরায় কংগ্রেসের ৫১ তম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র লণ্ডন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইউরোপ প্রবাসে তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিষ্ণুপুর অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। দুঃখ-নির্য্যাতনকে বরণ করিয়া লইয়া যাঁহার যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, আজ দেশবাসী তাঁহার সমুন্নত শিরে গৌরবসমুজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে।

স্বোল

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় মহাসভার ৫১ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা হইতে বি, এন, আরের বোম্বাই মেলযোগে, হরিপুরা যাত্রা করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী বার্দ্দৌলী ষ্টেশনে ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপালদাস দেশাই ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহাকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া স্থানীয় স্বরাজ আশ্রমে লইয়া যান। তথা হইতে কিছুক্ষ

পরে তাঁহাকে মোটরযোগে হরিপুরা গ্রামে স্বর্গীয় কালুভাই প্যাটেলের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। কালুভাই প্যাটেলের উদ্যোগেই হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুক্ত বসুকে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিহিতা একশত স্বেচ্ছাসেবিকা ও সমাগত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সম্বর্দ্ধিত করেন। একদল বালিকা তাঁহার ললাটে কুঙ্কুম পরাইয়া আরতি সহযোগে তাঁহার বন্দনা করে। অতঃপর বাঁশদার রাজার অশীতিবর্ষ পূর্ব্বের একখানি সুসজ্জিত রথে সুভাষচন্দ্র ও দরবার গোপাল দাস আরোহণ করেন। নানা অলঙ্কার শোভিত একান্নটি বলীবর্দ্দ-চালিত ঐ রথ চলার সঙ্গে সঙ্গে মিলিত ঘণ্টাধ্বনিতে এক অপূর্ব্ব শব্দ ঝঙ্কার উঠিতেছিল। সেই রথের পশ্চাতে ছয়টি শকটে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য কর্মকর্ত্তারা অনুগমন করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার প্রতিপংক্তিতে দশজন করিয়া লোক ছিল। চার মাইল দীর্ঘ এই শোভাযাত্রায় লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসী নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। পথিমধ্যে উভয় পার্শ্বে আবালবৃদ্ধবনিতা হর্ষধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। শোভাযাত্রা বিঠলনগরে পৌঁছিতে দুইঘণ্টা বিলম্ব হয়। বিঠলনগরে পৌঁছিয়াই সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যেরূপ রাজকীয় সমারোহে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বিঠলনগরে লইয়া যাওয়া হয়, তৎসম্পর্কে তিনি বলেন—'বিরাট জনতা আমাকে যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

করিয়াছে, তাহা আমাকে অভিভূত করিয়াছে। এই শোভাযাত্রার বর্ণনা প্রদান আমার পক্ষে সম্ভব নহে।'

১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে বিচিত্র সমারোহ ও নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিঠলনগরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সেই অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতীয় মহাসভার তরুণতম সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এই বিরাট জাতীয়যজ্ঞে পুরোহিতের আসন গ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের অধিক নরনারীর সমাবেশে বিঠলনগর জনসমুদ্রের আকার ধারণ করে। বাঙ্গালার একদল গায়িকার সুললিত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত গীত হওয়ার পর, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দরবার গোপালদাস দেশাই সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ পাঠ করেন। তারপর তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে মাল্যভূষিত রাষ্ট্রপতি বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া হিন্দী ভাষায় বক্তৃতার পর তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন; শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শ্রবণ করিতে থাকে।

সতের

রাষ্ট্রপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে উহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"মানব-ইতিহাসে সাম্রাজ্যসমূহের উত্থান-পতনই সর্ব্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচ্যের মত প্রতীচ্যেও ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যসমূহ একসময় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ ক্ষীণায়ু হইতে হইতে আবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। প্রাচীন যুগের রোমক সাম্রাজ্য এবং বর্ত্তমানযুগের তুর্কী ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যসমূহ এই বিশ্ব-নীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতের মৌর্য্য, গুপ্ত ও মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশ্বের ইতিহাসের এই সমস্ত দৃষ্টান্তের পরেও, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভিন্নরূপ পরিণতি হইবে, ইহা বলিতে কেহ সাহসী হইবেন কি? ইতিহাসের চৌমুহনী রাজপথে আজ ব্রিটীশ সাম্রাজ্য দণ্ডায়মান, ইহাকে অন্যান্য সাম্রাজ্যসমূহের পন্থানুসরণ করিতে হইবে, অথবা স্বাধীন জাতিসমূহের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইবে। এই দুইটির যে কোন পন্থাই ইহার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে এবং সেই ধ্বংসস্তূপের ভস্মরাশি হইতেই পুনরায় সোভিয়েট রাশিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রেট

বৃটেনের পক্ষে রাশিয়ার ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভের এখনও অবকাশ রহিয়াছে। বৃটেন ইহার সুযোগ গ্রহণ করিবে কি? ব্রিটীশ সাম্রাজ্য আজ নানাবিধ প্রভাবে প্রপীড়িত। বর্ত্তমানে বৃটেন 'সমুদ্রের রাণী' বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে না, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নৌ-শক্তির বলেই বৃটেনের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বিমান-শক্তির অভাবেই বিংশশতাব্দীতে বৃটেনের প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে ক্ষমতার সামঞ্জস্য রক্ষার নীতি গুরুতররূপে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। বিরাট ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল আজ যেরূপ শিথিল হইয়াছে, পূর্ব্বে কখনও এইরূপ হয় নাই

বিশ্ব-পরিস্থিতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ আজ নবতর শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। বিরাট মহাদেশ-সদৃশ আমাদের জন্মভূমিতে পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস। দেশের এই বিপুল লোকসংখ্যা ও ইহার বিরাট পরিধি এতাবৎকাল আমাদের দুর্ব্বলতার কারণ ছিল। আজ যদি সম্মিলিত হইয়া আমরা শাসকসম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইতে পারি, তবে উহা আমাদের বর্দ্ধিত শক্তিরই প্রমাণ দিবে। ভারতের এই ঐক্যের বিষয় উল্লেখের সময় আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রিটীশ ভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের বিভেদের সীমারেখা কৃত্রিম। ভারতবর্ষ অখণ্ড এবং ব্রিটীশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন

পার্থক্য নাই। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা লাভই আমাদের সকলের আদর্শ। যে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিতে পারে, আমার মতে, তাহার মধ্য দিয়াই এই স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ যে আন্দোলন করিতেছেন, কংগ্রেস উহা সমর্থন করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহার অতিরিক্ত কোন সাহায্য প্রদানে কংগ্রেস সক্ষম না হইলেও, কংগ্রেস কর্ম্মীদের পক্ষে দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনে ব্যক্তিগত-ভাবে সহায়তা করিবার কোন বিধিনিষেধ নাই। দেশীয় রাজ্যের সহকর্ম্মীরা আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্যলাভের আশায় রহিয়াছেন, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

ভারতের ঐক্যের বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার উল্লেখ করিতে হয়, কংগ্রেসের এতৎসম্পর্কিত নীতি বহুবার ঘোষিত হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাতে ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি ও কংগ্রেস-নীতি বিকৃত হওয়ায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে তাঁহাদের নীতি পুনরায় ঘোষণা করেন। মৌলিক অধিকারঘটিত প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, লোকের ধর্ম্ম, বিবেক ও সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা

হইবে না এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত নিয়ম-কানুন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভারতের ঐক্যের পরিপন্থী ও জাতীয়তার বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও কংগ্রেস বলিয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিমত অনুসারেই ইহার পরিবর্ত্তন করা হইবে। পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন সাধনের সুযোগ গ্রহণ করিতে কংগ্রেস সর্ব্বদা উৎসুক।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নূতন উদ্যমে আত্মনিয়োগ করিবার সময় বর্ত্তমানে সমুপস্থিত। ধর্ম্ম-বিষয়ে 'নিজেরা বাঁচিয়া থাক এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'—এই নীতি গ্রহণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিষয়ে একটি আপোষ-মীমাংসা করা খুবই সঙ্গত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার কথা চিন্তা করিতে মুসলমানদের কথা বড় হইয়া দেখা দিলেও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিষয়েও যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করিতে কংগ্রেস ব্যগ্র। অখণ্ড ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার রক্ষার দাবী লইয়াই আজ কংগ্রেস সংগ্রামরত। কংগ্রেসের অভীষ্ট লাভ হইলে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহও উপকৃত হইবে। ভারতের স্বাধীনতালাভে মুসলমানদের শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই—লাভবান হইবারই বরং সুবিধা রহিয়াছে। বিগত সতর

বৎসর, ধরিয়া কংগ্রেস তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অসুবিধা দূরীকরণের নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে সে সকল অসুবিধা দূরীভূত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

এখন আমি কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। জাতীয় সংগ্রামে অহিংস-অসহযোগ অথবা সত্যাগ্রহ কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা হইবে, ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। এই অহিংস-অসহযোগ কথাটিকে ব্যাপকতার দিক দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে আইন-অমান্য আন্দোলনও নিহিত থাকিবে। ইহাকে কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ সত্যাগ্রহ বলিতে আমি নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয় প্রকার প্রতিরোধই বুঝিয়া থাকি। তবে এই সক্রিয় প্রতিরোধ সম্পূর্ণ অহিংস ধরণের হইবে। আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমানে দুইটি পন্থা পড়িয়া আছে। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালনা এবং সংগ্রামের পথে যে সকল ক্ষমতা আমাদের হস্তে আসিবে, তাহা গ্রহণে অস্বীকার করা অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকালে আমাদের অবস্থিতিকে সুদৃঢ় করা—এই দুই পন্থার একটি পন্থা আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। নীতির দিক দিয়া উভয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য। তবে আমরা যে পন্থাই গ্রহণ করি না কেন, ব্রিটীশ-সম্পর্কচ্ছেদের প্রতি আমাদের চরম লক্ষ্য থাকিবে।

যখন ঐ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবে এবং আমাদের ভারতবর্ষে ব্রিটীশ প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন হইবে, তখনই তাহাদের সহিত মৈত্রীসূচক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার মত আমাদের অবস্থা হইবে। আয়র্লণ্ডের রাষ্ট্রপতির ন্যায় আমিও বলিতে চাই যে, ব্রিটীশ জনসাধারণের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্র বৈরীভাব পোষণ করি না। গ্রেট বৃটেনের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ণয় করিবার অধিকার অর্জ্জনের নিমিত্ত আমরা সংগ্রাম করিতেছি। আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পর ব্রিটীশ জনগণের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ না হইবার কোন কারণই নাই।

জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের অবস্থিতি কোথায় —অনেক কংগ্রেস কর্ম্মীর মনেও এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নাই। আমি জানি, আমাদের বহু বন্ধুর মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং উহার আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমি বলিতে চাই যে, স্বাধীনতা লাভের পরও কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবে না—বরং তখনই কংগ্রেসকে শক্তি, দায়িত্ব ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং পুনর্গঠনমূলক কর্ম্মসূচীকে কার্য্যকরী করিতে হইবে। জোর করিয়া কংগ্রেসের মূলে কুঠারাঘাত করিলে, দেশব্যাপী অনর্থের সৃষ্টি হইবে। মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ইউরোপের

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, যে সকল দেশে শক্তিশালী দল পুনর্গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সেই -সকল দেশে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে।

ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠন ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান বর্ত্তমানে সম্ভব না হইলেও, আমার বিশ্বাস এই যে, কেবলমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারাই দারিদ্র্য মোচন, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কিত আমাদের প্রধান জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে। এই পুনর্গঠন কার্য্যে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারকে সর্ব্বাগ্রে একটি কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। এই কমিশন জাতিগঠনের ব্যাপক কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। কমিশন কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কর্ম্মপন্থার দুইটি অংশ থাকিবে। প্রথম অংশে, অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী একটি কর্ম্মপন্থা এবং দ্বিতীয় অংশে, কিছুকাল যাবৎ অনুসরণের যোগ্য অপর একটি কর্ম্মপন্থা থাকিবে। প্রথম অংশ রচনার সময় নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ—

(১) আত্মত্যাগের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা,

(২) দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা,

(৩) ব্যক্তিগত ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা। যে বৈদেশিক শাসনের ফলে আমরা আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও হেয় অবস্থায় পতিত, আমাদের স্কন্ধ হইতে সেই গুরুভার অপসারণের

পর সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে।

জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধির নিমিত্ত একটি সাধারণ বর্ণমালা ও রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। অতঃপর বিমান, টেলিফোন, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতের বিচ্ছিন্ন অংশকে একত্রিত করিয়া একটি সাধারণ শিক্ষানীতির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্ত্তনের বিষয় আমি পুনরায় বলিতেছি। যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকটবর্ত্তী হইতে পারি, আমাদিগকে এইরূপ একটি বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইবে। রোমান বর্ণমালা প্রবর্ত্তনের কথা বলিলে অনেকেই হয়ত আতঙ্কিত হইবেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে এই সমস্যাটি বিবেচনা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। দেশের শতকরা নব্বইজন লোক অশিক্ষিত এবং তাহারা কোন বর্ণমালার সহিত পরিচিত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে বর্ণমালাই প্রবর্ত্তন করি না কেন, তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। রোমান বর্ণমালা গ্রহণের ফলে তাহারা অনায়াসে আর একটি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে; এই বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার অভিমত এই যে, হিন্দী ও উর্দ্দুর মধ্যে পার্থক্য

কৃত্রিম—সুতরাং এতদুভয়ের সংমিশ্রণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার সৃষ্টি হওয়া উচিত।

দারিদ্র্য দূরীকরণই পুনর্গঠনকার্য্যে আমাদের প্রধান ও প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ প্রয়োজন। কৃষি-ঋণ মকুব করিতে হইবে এবং পল্লীবাসীদের জন্য অল্পসুদে অর্থসাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উৎপাদক ও গ্রাহক উভয়ের সুবিধার নিমিত্ত সমবায় আন্দোলনের প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একমাত্র কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না; রাষ্ট্রীয় অধিকারে ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পবাণিজ্যের প্রসারও প্রয়োজন। ভারতের অভ্যন্তরে বৈদেশিক শাসন বিদ্যমান থাকিবার এবং বাহিরে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হইবার ফলে, এই দেশের পুরাতন শিল্পবাণিজ্য-পদ্ধতি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। উহার স্থলে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ প্রয়োজন। আধুনিক ফ্যাক্টরীসমূহের প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কোন্ কোন্ কুটীর-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে এবং ব্যাপকভাবে উৎপাদনের নিমিত্ত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা হইবে, পুনর্গঠন কমিশন তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। এই কমিশনের সুপারিশ ক্রমে

রাষ্ট্রকে আমাদের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে উৎপাদন ও ব্যবহারের উভয়ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত করিতে হইবে। যেই প্রকারেই হউক, অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্যে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োজিত করিতে হইবে।

' ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশে বিরোধিতার সম্ভাবনা নাই। ইহার ফলে কংগ্রেসকে কেবলমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করা যাইতে পারে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে কিরূপে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা সম্ভব? সর্ব্বপ্রথম আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে; ইহা অসম্ভব হইলে কংগ্রেসের পক্ষে দুঃখের কারণ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, কারা-সংস্কার, সেচ-শিল্পবাণিজ্য-ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিক ও কৃষিমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে জাতিগঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করিবেন। এই সমস্ত বিষয়ে ভারতের সর্ব্বত্র অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সঙ্গত। দুইটি উপায়ে এই ঐক্য-ব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ সম্মিলিত হইয়া একটি সমভাবাপন্ন কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শানুসারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সাহায্য

করিতে পারেন। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সহায়তা করিবার সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে উক্ত প্রদেশসমূহের বিভিন্ন সমস্যার সহিত পরিচিত থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কিছু বলিতে চাই। এই কমিটি কেবলমাত্র ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সৈন্যদল নিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ নহে, ইহা স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা। সেই জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে স্বাধীন ভারতের প্রাক্-মন্ত্রিসভার ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি ডি' ভ্যালেরার প্রজাতন্ত্র যখন ব্রিটীশ সরকারের সহিত সংগ্রামলিপ্ত ছিল, তখন তাঁহারাও এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাসনাধিকার লাভের পূর্ব্বে মিশরের ওয়াকফ-দলও এইরূপ নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যপরিচালনা অপেক্ষা নূতন শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাকে কি-ভাবে বাধা দান করিতে হইবে, তাহা বিবেচনার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা সম্পর্কিত কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবার পর এই প্রস্তাবটি বর্ত্তমান অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণের কারণ সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলিতেছি। নূতন শাসনতন্ত্রের

বাণিজ্য ও অর্থবিষয়ক রক্ষাকবচগুলিই এই পরিকল্পনার প্রতি আমাদের বিরুদ্ধভাব পোষণের অন্যতম কারণ। কেবলমাত্র দেশরক্ষা বিভাগ ও পররাষ্ট্র নীতিতে জনসাধারণের অধিকার থাকিবে না এমন নহে, ইহাতে সরকারের ব্যয়ের অধিকাংশ অংশের উপর জনগণের প্রতিনিধিবর্গের বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের বাজেট-প্রস্তাব অনুসারে সরকারের মোট ব্যয়ের শতকরা সাতান্ন ভাগই সেনা-দলের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের যে সংরক্ষিত অংশ বড়লাট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়ের শতকরা আশী ভাগ। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যুক্তরাষ্ট্রীয় রেল বিভাগ প্রভৃতি ব্যবস্থাতন্ত্র ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়াছে ; উহা যুক্তরাষ্ট্রের নামমাত্র অধীনে পরিচালিত হইবে। রেল বিভাগের নীতি সম্পর্কে আইনসভার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না ;—মুদ্রানীতি ও বাট্টার হার নির্দ্ধারণের ব্যাপারটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলকথা হইলেও তাহার উপর এই আইনসভার কোন কর্ত্তৃত্বই থাকিবে না। পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপারগুলি প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে 'সংরক্ষিত বিষয়' বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিবার সাধারণ স্বাধীনতাটি পর্য্যন্ত ভারতীয় আইনসভাকে প্রদান করা হয় নাই। এতদ্বারা আর্থিক স্বাধীনতা গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারত শাসন আইনে যে সকল বাণিজ্যসংক্রান্ত অসম-সংরক্ষণ ব্যবস্থার নির্দ্দেশ

আছে, তাহাতে ভারতের জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যও যখন ব্রিটীশ স্বার্থের প্রতিকুল হইবে (উহা সর্ব্বদাই হইতে বাধ্য), তখন কোনরূপ ব্যবস্থার দ্বারা ঐগুলিকে রক্ষা করা বা উহার প্রসারে সহায়তা করা সম্ভব হইবে না। এই ভারত শাসন আইনে যে সকল অসমঞ্জস বাণিজ্যিক নীতি আছে, তাহা যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া যদি কখন কোন ব্রিটীশ-পণ্যের উপর অতিরিক্ত আমদানী-শুল্ক ধার্য্যকরণ বা অন্য কোন প্রকারে উহার আমদানী সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হয়, তবে বড়লাট উহা অগ্রাহ্য করিয়া দিতে পারেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতাবলে বাতিলের বহির্ভূত ব্রিটীশ স্বার্থ-বিরোধী কোন প্রস্তাব আইন-পরিষদে বা শাসনতন্ত্রের অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হইতে পারিবে না। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা-কল্পে জাতীয় ও বিজাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে প্রয়োজনমত বৈষম্য-মূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অধিকার আমরা কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারি না।

আর্থিক স্বাধীনতা ও বাণিজ্যবিষয়ক সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্য্যকরী বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির কথা বলিব। ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য ও ইহার বৈদেশিক বাধ্যবাধকতার প্রতি লক্ষ্য

রাখিয়া ব্যাপকভাবে ঐরূপ নীতির বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য-চুক্তি সাধন 'দুর্ঘট হয় অথবা সাম্রাজ্যের বাহিরের যে সমস্ত দেশ ভারতীয় পণ্যের ক্রেতা, তাহাদের সহিত ব্যাবসাক্ষুণ্ণকর কোনপ্রকার চুক্তি ইংলণ্ডের সহিত করা সঙ্গত হইবে না। ভারতের বহির্বাণিজ্যের পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এখনও ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-আলোচনা চলিতেছে; পক্ষান্তরে অটোয়া-চুক্তির নোটিশের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় আইনসভা কর্ত্তৃক নাকচের সিদ্ধান্তসত্ত্বেও উহাকে এখনও বহাল রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি হইলে, ইংলণ্ডের অনুকূলে তুলাদণ্ড ঝুঁকিয়া পড়িবেই। বাণিজ্য-চুক্তির আশ্রয়ে এই দেশে অ-ভারতীয় কায়েমী-স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবার পূর্ব্বে উহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও আর্থিক ফলাফল সম্বন্ধেও আমাদিগকে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। আমি আশা করি, বর্ত্তমানে যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তির আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সরাসরি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে বাধা উপস্থাপিত হইবে না এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন না।

প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল ও প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের

ক্ষমতার তুলনা করা যায় না। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের গঠন অত্যন্ত প্রগতিবিরোধী। দেশীয় রাজ্যসমূহের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় চব্বিশজন মাত্র। তাহা সত্ত্বেও দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিগণকে (তাঁহাদের প্রজাবৃন্দকে নহে) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নতর পরিষদে শতকরা তেত্রিশটি ও উচ্চতর পরিষদে শতকরা চল্লিশটি আসন দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সরকার যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা এ দেশের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিতেছেন, তাহাতে বাধা প্রদান করিবার সাফল্যের উপরই আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে—সর্ব্বশেষে আমাদিগকে হয়ত ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের আশ্রয় লইতে হইবে। ভবিষ্যতে যদি এইরূপ ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা কেবল ব্রিটীশ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যেও উহা বিস্তৃতি লাভ করিবে।

অদূর ভবিষ্যতে কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইলে আমাদিগকে যথাযথভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে 'জন-জাগরণ এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ

করিয়াছে যে আমাদের দলপরিচালনা সম্পর্কে বহু নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে কোন সভা-সমিতিতে পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাবেশ হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে এইরূপ সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ইহা ছাড়া এই বিরাট জন-জাগরণকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিবার বৃহত্তর সমস্যাও বিদ্যমান। এই জন্য আমাদের সুসংবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আছে কি? ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দ ও তরুণ কর্ম্মীদের জন্য আমরা কোনপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি কি? আধুনিক রাজনৈতিক দলের এই সকল প্রয়োজন মিটাইবার এখন সময় আসিয়াছে। সুশিক্ষিত অধিনায়কবৃন্দ পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। রাজনৈতিক কর্ম্মীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে আমরা যোগ্য রাজনৈতিক নেতা লাভ করিতে পারিব। বিলাতে নিদাঘ-বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; এইরূপ শিক্ষাদান একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের কোন কোন দেশ কি-ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতেছেন, তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের আদর্শ ও শিক্ষার প্রণালী তাঁহাদের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইলেও, ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে আমাদের কর্ম্মীদের জন্য বৈজ্ঞানিক ধারায় সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। নাৎসীদের

শ্রমিক সেবাবাহিনীর ন্যায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিবেচনাযোগ্য এবং উপযুক্তভাবে সংশোধন করিয়া প্রবর্ত্তন করিলে উহা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে।

সঙ্ঘানুবর্ত্তিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা সম্পর্কেও আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সহিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণ সভাসমূহের সম্পর্কের কথাই আমি বলিতেছি; উহা আমাদের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। কেহ কেহ কংগ্রেসের বহির্ভূত যে-কোন প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করেন এবং কেহ কেহ উহাদের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। আমার মতে, উহাদের অস্তিত্ব আমরা পছন্দ করি বা না করি, উহাদের সহিত আমাদিগকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। প্রশ্ন হইতেছে, উহাদের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংগ্রামে কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধি। কংগ্রেসের বিরোধীদলরূপে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং, এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের আদর্শে ও কার্য্যপন্থায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। এইজন্য ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাসমূহে কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দের দলে দলে যোগদান কর্ত্তব্য। শ্রমিক ও কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতি অধিক অবহিত হইয়া ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ

সভাসমূহ যদি কংগ্রেসকে দেশের মুক্তিসাধনার সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন, তবে কংগ্রেস ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা সহজসাধ্য হইতে পারে, সমষ্টিগত সমর্থন বা সংযোগ সাধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল গঠনে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে আমি ওকালতি করিতেছি না এবং আমি উহার সদস্য নহি। তাহা সত্ত্বেও আমি বলিব যে ইহার সাধারণ নীতির সহিত আমি প্রথম হইতেই একমত। প্রথমতঃ, বামপন্থীদের একটি দলে সুসংহত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, বামপন্থীদলের প্রকৃতি যদি সমাজতন্ত্রমূলক হয়, তাহা হইলে একটি বামপন্থী 'ব্লক' (বিরোধীদল) থাকার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে। এইরূপ 'ব্লক'কে দল বলা হইলে অনেকে আপত্তি করেন; আমার মতে, এইরূপ পার্থক্য সৃষ্টির কোন অর্থ হয় না। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নিয়মতন্ত্র অনুসারে ঐরূপ চরমপন্থী বিরোধী-দল গঠন করা কিছুই অন্যায় নহে—উহাকে দল বা লীগ বা ব্লক যে কোন নামই দেওয়া যাইতে পারে। কংগ্রেস সমাজ-তন্ত্রীদল বা অনুরূপ দলকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী বা চরমপন্থীদল স্বরূপ কার্য্য করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রবাদ

আমাদের আশু সমাধানযোগ্য সমস্যা নহে; কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদে আস্থাবান কংগ্রেস সমাজ-তন্ত্রীদলের দ্বারা সেই প্রচার-কার্য্য চলিতে পারে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ একটি সমস্যা সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ আগ্রহান্বিত। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জ্জাতিক সংযোগ স্থাপনের বিষয় উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় যে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে যে তাহা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই জন্য বিশ্বপরিস্থিতির প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে এবং কিরূপে তাহার সুযোগ গ্রহণ করা যায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে মিশরের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কোনপ্রকার হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ না করিয়া মিশর কিরূপে স্বাধীনতার সন্ধি-চুক্তি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল? তাহারা ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ইতালীয় বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে কোন দেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতি বা উহার রাষ্ট্রীয় গঠন আমা-দিগকে যেন প্রভাবান্বিত না করে। প্রত্যেক দেশেই ভারতের

মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নরনারী থাকিবেই। প্রত্যেক দেশেই ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নরনারীর দল গঠন করিতে হইবে। বিদেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র আছে, তাহারাও আমাদের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতে পারে। ভারতীয় ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখিতে পারিলে, তাহারাও এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। বিদেশের ভারতীয় ছাত্রগণের সহিত ভারতের জাতীয় মহাসভার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রাখিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ছায়াচিত্র যদি আমরা বিদেশে পাঠাইতে পারি, তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসাধারণ আমাদের বিষয় অবগত হইবে এবং আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইব। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় জাতীয় মহাসভার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক আন্তর্জ্জাতিক সভা বা সম্মেলনে ভারতবর্ষকে যোগদান করিতে হইবে। এইরূপ সভা-সম্মেলনে যোগদানের ফলে ভারতের প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং বিশ্বজনমতের নিকট ভারতের দাবী স্বীকৃত হইবে।

এসিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষতঃ জাঞ্জিবার, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয় ও সিংহলের প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার বিষয় আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

তাঁহাদের সম্পর্কে কংগ্রেস সর্ব্বদা গভীর মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। আমরা এখনও দাস-জীবন যাপন করিতেছি বলিয়া তাঁহাদের জন্য প্রয়োজনানুরূপ কিছু করা হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। স্বাধীন ভারত বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে বিরাট শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে; তখন প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থসংরক্ষণে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না।

এই প্রসঙ্গে পারস্য, আফগানিস্থান, নেপাল, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের আবশ্যকতার উল্লেখ করিতে চাই। এই সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক পরিচয় ও সহযোগিতা থাকিলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হইবে। ব্রহ্ম ও সিংহলের সহিত আমাদের সংযোগ বহু যুগের বলিয়া এই দুইটি রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠতম সংস্কৃতিগত সম্পর্ক রাখিতে হইবে।

এক্ষণে আমি আটক এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান সমস্যা। বন্দীগণের অনশনের ফলে এই সমস্যাটি জনসাধারণের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আশু মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, আমার এই মন্তব্যে কংগ্রেসের মনোভাব ব্যক্ত হইবে।

যে সকল আটক ও রাজনৈতিক বন্দী কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে অবরুদ্ধ আছেন, তাঁহারাই কেবল দুঃখভোগ করিতেছেন না ; যাঁহারা আজ মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থাও অধিকাংশক্ষেত্রে শোচনীয়। যক্ষ্মার মত নানারূপ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিয়াছেন। অনাহারের ভয়াবহ সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে। আত্মীয়-পরিজনবর্গের হাসিমুখের অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে, অশ্রুজলের করুণ অভিনন্দন তাঁহারা লাভ করেন। মাতৃভূমির সেবায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা বিনিময়ে দুঃখ ও দারিদ্র্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই ? অতএব, যাঁহারা দেশপ্রীতির অপরাধে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে যেন আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রেরণ করি এবং তাঁহাদের দুঃখলাঘবের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করি।

বন্ধুগণ ! আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে যে পার্থক্য বিরাজমান, তাহাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা অর্থহীন। বাহিরে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান ; আমাদিগকে এই আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। এই সঙ্কটকালে আমাদের কর্ত্তব্য কি ? যাত্রাপথের ঝড়ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদিগকে শাসকশ্রেণীর

ছলকৌশল বিস্তারের প্রতিরোধ করিতে হইবে। কংগ্রেসই বর্ত্তমানে গণ-সংগ্রামের সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদল থাকিতে পারে—কিন্তু ইহা ভারতের মুক্তিকামী সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানের মিলনক্ষেত্র। অতএব, আসুন, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করুন। কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করুন—বামপন্থীদের প্রতি ইহাই আমার আবেদন। ব্রিটীশ সাম্যবাদীদলের নেতৃবৃন্দের মনোভাবে বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া আমি এই আবেদন করিলাম। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটীশ সাম্যবাদীদলের সাধারণনীতি কংগ্রেসের নীতির প্রায় অনুরূপ।

উপসংহারে আপনাদের মনোভাবের প্রত্যাভিব্যক্তিস্বরূপ আমি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, জাতির মুক্তির জন্য মহাত্মাজী আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ তাঁহাকে কিছুতেই হারাইতে পারে না। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন, আমাদের সংগ্রামকে হিংসা-দ্বেষ মুক্ত রাখিতে তাঁহাকে প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা ও সর্ব্বমানবের কল্যানের জন্য গান্ধীজীর সাহচর্য্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নহে—বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম

করিতেছি না—সর্ব্বমানবের মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতার সহিত বিশ্বমানবের মুক্তি-সমস্যা বিজড়িত।”

আভাষ

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস-কার্য্যকলাপের বিস্তৃত সালতামামি প্রদান এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নহে। আলোচ্য বৎসরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে আমি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। পার্লামেণ্টারী কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রিবর্গ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। গভর্ণরদের সহিত তাঁহাদের কয়েকবার মতানৈক্য হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন—জাগ্রত জনমতের নিকট গভর্ণরগণকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এই প্রকার ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল। পার্লামেণ্টারী কার্য্য-কলাপে কংগ্রেসের মর্য্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। সিন্ধু, আসাম, পাঞ্জাব এবং বাঙ্গালাদেশেও কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। আসামে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈর অধিনায়কত্বে কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। সিন্ধুতে যে-কোন সময়েই কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতে পারে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোনপ্রকার চেষ্টার ক্রটি হয় নাই। হিন্দু-মুস্লিম সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ং মিঃ জিন্নার দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। মুস্লিম লীগের অসঙ্গত দাবীর ফলে কংগ্রেসের সমস্ত উদ্যম বার্থতায় পর্য্যবসিত হইলেও, কংগ্রেসে মুসলমান সদস্যবৃন্দের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় ঘটনা। সেই আন্দোলনের এখনও পরিসমাপ্তি হয় নাই। তালচর, ধেনকানল, রাজকোট, মহীশূর, হিন্দোল, জয়পুর, রণপুর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে গণ-জাগরণের বিপুল প্লাবন আসিয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের প্রতিবাদকল্পে দেশীয় রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তুমুল সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা ও নির্য্যাতন বরণ করিয়া প্রজাবৃন্দ সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প। স্থলবিশেষে শৃঙ্খলা ও অহিংসনীতি হইতে যদিও তাঁহারা স্খলিত হইয়াছেন, তথাপি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নীতি অনুযায়ী তাঁহারা তাঁহাদের সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছেন। একদিকে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ও রাজন্যবর্গ মৈত্রীবদ্ধ হইতেছেন এবং অপর

পক্ষে ব্রিটীশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রজাবর্গ পরস্পর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। অনতিবিলম্বে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইলে, উহা শুধু ব্রিটীশ ভারতে নিবদ্ধ থাকিবে না—ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহেও সেই আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করিবে।

বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যার সমাধানের ফলে ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিহারের প্রবাসী বাঙ্গালীরা সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার ব্যাপারেও ন্যায্য সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছিল। বাঙ্গালীদিগকে ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট লইতে বাধ্য করার যে-নীতি বিহার গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া তৎসম্পর্কে বাঙ্গালীরা প্রতিবাদ জানাইতেছিল। সংবাদপত্রে, সভা-সমিতিতেও বাদ-বিসম্বাদে ব্যাপারটি এমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অবশেষে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি উহার একটা সন্তোষজনক মীমাংসার ভার গ্রহণ করেন এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর তদন্তের ভার ন্যস্ত হয়। তাহার পর দীর্ঘ দুই বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া যায়। অবশেষে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির বার্দ্দৌলী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত

হয়। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ সংক্ষেপে এইরূপ :— (১) ভারতের যে কোন প্রদেশে যে কোন ভারতীয় চাকুরী পাইতে পারিবেন। (২) বিহারী ও বিহারের বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য করা হইবে না। (৩) ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট প্রথা রহিত করিতে হইবে। (৪) চাকুরী প্রার্থীরা তাঁহাদের দরখাস্তে অধিবাসী অথবা ডোমিসাইল্ড বলিয়া উল্লেখ করিবেন। স্থানীয় অধিবাসী ও অনগ্রসর-শ্রেণীকে কতকাংশে সুবিধা দানের যে সুপারিশ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক গঠিত নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবে। যে কোন ব্যক্তি দশ বৎসর কোন প্রদেশে বাস করিলেই ঐ প্রদেশে ডোমিসাইল্ডরূপে গণ্য হইবেন। এই নির্দ্দেশগুলির বিপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। ভারতীয়মাত্রকেই একটি অখণ্ড জাতি হিসাবে গণ্য করিবার যে নীতি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের মূল আদর্শ ও গণতন্ত্রের অনুকূল। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন হইয়াছে! যাহাদের মাতৃভাষা স্কুলের প্রচলিত ভাষা হইতে ভিন্ন, সংখ্যায় যথোপযুক্ত হইলে তাহাদের জন্য যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষাতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে, তৎপ্রতিও ওয়ার্কিং কমিটি দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত করিয়া দেশবাসী যোগ্য ব্যক্তির উপরেই যোগ্য ভার অর্পণ করিয়াছিলেন; সুভাষচন্দ্র উহার অমর্য্যাদা করেন নাই। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি-জীবন গৌরবব্যঞ্জক। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি জাতির মনোভাব বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনে বড়লাট বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি বিনয় সহকারে তাঁহাকে (বড়লাটকে) জানাইতেছি যে, আমরাও যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি ইহাও বলিতে চাই যে, সরকারী মুখপাত্রগণ যাহাই বলুন না কেন, কংগ্রেস যতদিন এই সমস্যা সম্পর্কে সঙ্ঘবদ্ধ থাকিবে, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করা ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যদি ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা কয়েক বৎসরের জন্য ফেলিয়া রাখেন, তাহা হইলে আমাদের কি হইবে—ইহাই আমাদের নিকট প্রধান সমস্যা। আমরা কি নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন থাকিব অথবা আমাদের জাতীয় দাবী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণের জন্য ব্রিটীশ সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিব? ত্রিপুরী কংগ্রেসে ইহারা উত্তর চাই।"—সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় ভারতের মর্ম্মকথা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে নিরপেক্ষতার

হানি হইবে। সুভাষচন্দ্র যদি কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতেন, তবে মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারের প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চূড়ান্ত অবিচার করিতে সক্ষম হইতেন না।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল ঃ—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু (সভাপতি), পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, খান আবদুল গফুর খান, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, আচার্য্য জে বি কৃপালনী (সাধারণ সম্পাদক), শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ভুলাভাই দেশাই, হরেকৃষ্ণ মহতাব (উড়িষ্যা), ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শঙ্কর রাও দেও।

উনিশ

১৩৪৫ সালের ৭ই মাঘ রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। কবিগুরু নিজে রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন ঃ—

"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র ! আমাদের যা' বলবার কথা, হাজার বছর পূর্ব্বে আমাদের ঋষিরা তা' বলে গেছেন। সমস্ত দেশের

অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ। আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে সেই আসনের বার্ত্তা রয়েছে ঋষিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে—তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন। আমরা খুসী হয়েছি আজ তোমাকে এখানে পেয়ে। আমার খুসী হবার একটা কারণ হচ্ছে, এই সুযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে। বাণীর সাধনায় আমার সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। যাঁরা আমাকে ভালবাসেন তাঁরা বলেন, আমি একটা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি বাগ্‌দেবতার কল্যাণে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে পড়বে এই কর্ম্মক্ষেত্রে আমার পরিচয়। মানুষের মানবত্বের পরিচয় যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, ত্যাগ ও সাধনার ক্ষেত্র যদি এখানে খুলে থাকে, তাহলে তুমি আনন্দিত হবে আমি জানি। আর সে পরিচয় আমি গর্ব্বের সঙ্গে তোমাকে দিতে চাই; এই কারণে দিতে চাই—তুমি এখানে দেশের কর্ণধাররূপে এসেছ, দেশ তোমাকে স্বীকার করেছে। এখানে দেশের যে সাধনা সে তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। যদি তুমি স্বীকার কর তাহলে এ চিরকালের জন্য সার্থক হবে। আমার সৌভাগ্য আজ তোমাকে আহ্বান করে এনেছে আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্র—তুমি আমাকে জানবে।

তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার সঙ্কল্প আছে জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। তুমি বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। অন্য দেশকে আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটবে না। আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালাকে জানি—বাঙ্গালার প্রয়োজন অসীম। সেই জন্য তোমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার করতে হবে। এখানে তুমি আমাদের অতিথি ও বন্ধু। আমাদের দেখে আমাদের কার্য্যভার যদি লাঘব করতে পার, কর। অবসর হ'লে আসতে যেতে হবে।

দেশে যারা অপমানিত তাদের সম্মান দেবার জন্য আয়োজন করেছি এখানে। এখানকার হাওয়াতে এখানকার ছেলে মেয়েদের যে আনন্দ, তাতে তাদের দাবী আছে, এই জন্য তারা জন্মেছে। তা নইলে কেন ফুল ফোটে, দিনান্তে কেন পাখী ডাকে, যদি তারা ক্লাস ঘরে ঢুকে দাগ কাটা passage মুখস্থ করে জীবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে। কি দুর্ভাগ্যে মানুষ সৌন্দর্য্যবোধ থেকে বঞ্চিত থাকবে। শিক্ষাটা সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষাকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তারা তাকে পীড়িত করে; মানুষের মনকে তারা কেটে কেটে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে আহ্বান করেছি—মুক্তি এবং আনন্দের স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি। কাজ যা করবার তা সম্পূর্ণ হয়নি। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে তুমি আমার কর্ম্মের পরিচয় নিয়ে যদি তাকে স্বীকার করতে পার, সুখী হব।”

• কবিগুরুর সম্বর্দ্ধনার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন ঃ—“আপনার যে অখণ্ড সাধনা, সেটা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ভারতবাসী যে

সহজে উপলব্ধি করবে, এটা আশা করা অন্যায়। আমিও সেই সাধারণের মধ্যে একজন। সুতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড সাধনা, মহত্ত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করতে পারব, সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমি করি না, সে উপলব্ধি একদিনে আসে না। সে উপলব্ধি 'হচ্ছে ক্রমিক এবং সারা জীবনব্যাপী। তবে আমার মনে হয়, যদি আমরা চলার পথে চলতে থাকি তা'হলে সে উপলব্ধি ক্রমশঃ প্রসারলাভ করবে।

মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, আপনি উপস্থিত না থাকলে আপনার সাধনার কি হবে। আমি বলতে চাই—কোন বস্তু বা সাধনা মরতে পারে না, যতদিন তার সার্থকতা আছে। যে সত্য ও সাধনা নিয়ে আপনার সমস্ত জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন শান্তি-নিকেতন বাঁচুক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্য্যন্ত সে সত্য ও সাধনা জাতির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকবেই থাকবে। শুধু তাই নয়, এ রকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে।

আমরা, যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি।

প্রাণের দিক দিয়ে যে সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হতে পারে না, সেই সম্পদ সেই প্রেরণা আমরা চাই। কারণ আমরা জানি—সেই প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস যদি প্রাণের মধ্যে পাই তা'হলে আমাদের কর্ম্মজীবনের ও বহির্জ্জীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে। আপনার কাছ থেকে সেই প্রেরণা আমরা চাই।

আমরা হয় ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি; কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন, আমরা চাই সব দিক দিয়ে আমাদের অখণ্ড জাতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র। বাণীর বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্য্যবসিত হয় নাই, শুধু ভগবানের উপাসনায় আপনার সাধনা পর্য্যবসিত হয় নাই, অন্তরের আদর্শকে আপনি বহির্জ্জীবনে মূর্ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই—এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ, কারণ এটা আমাদের জাতীয় আদর্শ। আমাদের জীবনে তা' সফল করতে পারি না পারি সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি, বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতেও করব।"

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন ঃ—

"আমরা যে নূতন ভারত তৈরী করব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর। তাকে ভিত্তি করে স্বরাজের সৌধ নির্ম্মিত হবে। তার মধ্যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ফুটিয়ে তুলতে পারব, ভারতবর্ষকে আবার ধনধান্যে পূর্ণ করতে পারব এবং ভারতের নরনারীকে সকল রকমে যোগ্য করে তুলতে পারব। যেদিন ভারতের প্রত্যেক নরনারীকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত করতে পারব, সেদিন আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। শান্তি-নিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষার যে আয়োজন হয়েছে তার যদি সদ্ব্যবহার হয়, তা'হলে জাতিসংগঠনকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হবে।"

৮ই মাঘ রবিবার প্রাতে সুভাষচন্দ্র শ্রীনিকেতন বালিকা বিদ্যালয় এবং শিল্প ভবনের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। শ্রীনিকেতনে উপস্থিত হইলে শিক্ষাসত্র ও শিল্প ভবনের ছাত্রেরা সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবৃন্দের সহিত কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর শ্রীযুক্ত বসু বাঁধগড়া গ্রামে গমন করিয়া বিশ্বভারতীর পল্লীমঙ্গলকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। উক্ত কেন্দ্রের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিশাপতি মাঝি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে তিনি নূতন বিদ্যালয়গৃহের উদ্বোধন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন :—

"ভারতবর্ষের পল্লীর উন্নতিসাধনই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তবে বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের চেষ্টায় সে কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। এখানে যে মহৎ চেষ্টা চলিতেছে, তাহা সমগ্র দেশের গৌরবের বস্তু।"

অতঃপর রাষ্ট্রপতি বসু বল্লভপুর গ্রামে মুক্ত রাজবন্দীদের প্রতিষ্ঠিত "অমর কুটির" পরিদর্শন করেন। মুক্ত রাজবন্দীদের সংগঠনকার্য্য সন্দর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দিত হন। অপরাহ্নে তিনি শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় বোলপুরের এক বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন।

ত্রিপুরী

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন

ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম সভাপতি নির্ব্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। অতীতে কতিপয় প্রধান নেতৃপুরুষই প্রকৃতপক্ষে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতেন। তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করিতেন, ভক্তের দল বেদ-বাক্যের ন্যায় তাহাই মানিয়া লইত। ১৯৩২-৩৩ খৃঃ ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন ও ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হইবার পর, মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত

অধিকাংশ পরিবর্ত্তনই কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায়, অনেক সমালোচকের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হয় যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে গান্ধীবাদ যেরূপ দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহাতে ভিন্ন-মতবাদীর কোন স্থান হইবে না। অতঃপর রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষমতার পরিবর্ত্তে গান্ধী-মতবাদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করাই কংগ্রেসে উচ্চস্থান লাভের পন্থা হইয়া দাঁড়াইবে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রবাদী দলের অধিনায়কত্বে বামপন্থিগণই সর্ব্ব-প্রথম দক্ষিণপন্থীদিগের এই অপকৌশলে বাধা প্রদান করিলেন। বামপন্থীদিগের সেই বাধা প্রদানই বর্ত্তমানে সভাপতি নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় গুরুত্বের আকার ধারণ করিয়াছে।

বার্দ্দোলীতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী হইতে ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকের পর ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিপদের জন্য সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু মৌলানা আজাদ বোম্বাই হইতে ২০শে জানুয়ারী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার নাম প্রত্যাহার করেন এবং কর্ত্তব্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া ডাঃ সীতারামিয়ার প্রার্থী-পদ সমর্থন করেন। মৌলানা আজাদের বিবৃতি ঃ—

"কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতিপদের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক যাঁহাদের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত হইয়াছে, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমি

কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে জানাইতেছি যে, আমি সভাপতি পদপ্রার্থী তালিকা হইতে আমার নাম প্রত্যাহার করিতেছি। গত দুই বৎসর কাল কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির কার্য্যে ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকায় আমার স্বাস্থ্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সেই জন্য আমি মনে করি যে, সভাপতি পদের দায়িত্ব বহন করিতে এবং কার্য্যের অতিরিক্ত চাপ সহ্য করিতে অসমর্থ। সভাপতি পদের জন্য ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার নামও প্রস্তাবিত হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। আমি আমার নাম প্রত্যাহার করিব না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন ; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, আমি তাঁহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনি একজন অক্লান্তকর্ম্মী ও ওয়ার্কিং কমিটির পুরাতন সদস্য। সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য আমি প্রতিনিধিদের নিকট তাঁহার নাম সুপারিশ করিতেছি। আমি আশা করি, তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।"

[সর্দ্দার প্যাটেল ও অন্যান্যদের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মৌলানা আজাদ তাঁহার বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।]

২১শে জানুয়ারী শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :—

"আমি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিবৃতি পাঠ করিয়াছি। তিনি স্বীয় নাম প্রত্যাহার করায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আসন্ন সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমি কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। ব্যাপারটি ব্যক্তিগত নহে, কাজেই এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে সকল রকম কৃত্রিম সৌজন্য পরিহার করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে এবং নূতন ভাবধারা, নূতন আদর্শ ও কর্ম্মসূচীর সমস্যা দেখা দিয়াছে।

অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত ভারতে রাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে কোনও বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। এই সকল কারণে জনগণ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচনেও নির্দ্দিষ্ট সমস্যা এবং কর্ম্মতালিকার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। এইদিক হইতে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছনীয়ও নহে।

এই পর্য্যন্ত কোন প্রতিনিধিই আমাকে নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলেন নাই। পক্ষান্তরে আমার অজ্ঞাতসারে অথবা বিনা সম্মতিতে মনোনয়ন করা হইয়াছে। আমি যাহাতে নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া না দাঁড়াই, তজ্জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য দল আমাকে অনুরোধ করিতেছেন; অধিকন্তু আমাকে আর এক বৎসর কংগ্রেস-সভাপতিরূপে কাজ করিতে দেওয়া হউক, সর্ব্বসাধারণ ইহাই

চাহেন বলিয়া আমার মনে হয়। হইতে পারে আমার এই ধারণা সত্য নহে এবং অধিকাংশ প্রতিনিধি আমার পুনর্নির্ব্বাচন চাহেন না। তবে আগামী ২৯শে জানুয়ারী নির্ব্বাচন হইবে। সেই দিন ইহার সত্যতা স্থির হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

কর্ম্মী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমি কি ভাবে কাজ করিতে পারি, তাহা আমার বলিবার কথা নহে। আমার দেশবাসিগণ ইহা স্থির করিবেন; বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে উহার সিদ্ধান্তের ভার আমার সহকর্ম্মী প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত। আমাকে যদি বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কাজ করিতে বলা হয়, তাহা অস্বীকার করিবার অধিকার আমার নাই। প্রকৃত পক্ষে আমার উপর কোন দায়িত্ব ন্যস্ত হইলে তাহা যদি আমি বহন না করি, তবে আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব। আন্তর্জাতিক বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নূতন বৎসর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। এই সকল কারণে অধিকাংশ প্রতিনিধি যদি আমাকে কংগ্রেস সভাপতিপদে পুনরায় নির্ব্বাচন করিতে চাহেন, তবে আমি কোন্ যুক্তিতে প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইব? তবে মৌলানা আজাদের ন্যায় বিশিষ্ট নেতা যেরূপ আবেদন করিয়াছেন, তাহার ফলে অধিকাংশ প্রতিনিধি যদি আমার পুনর্নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে আমি বিশ্বস্তভাবে

তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইব এবং সাধারণ সৈনিক হিসাবে কংগ্রেস ও দেশের সেবা করিব। নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার আমার অধিকার নাই। অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে আমার বিষয়ে বিবেচনা করিবার ভার প্রতিনিধিবর্গের হস্তে অর্পণ করিলাম। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তই আমি মানিয়া লইব।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম, শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও, শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বার্দ্দৌলী হইতে ২৪শে জানুয়ারী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন ঃ—

"আমরা যথোচিত সতর্কতার সহিত সুভাষবাবুর বিবৃতি পাঠ করিয়াছি। আমরা যতদূর জানি, এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুভাষবাবু একটা নূতন নজির খাড়া করিয়াছেন এবং এরূপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে। তবে তাঁহার অবলম্বিত পন্থা কতদূর সমীচীন তাহা কেবল অভিজ্ঞতা দ্বারাই জানা যাইতে পারে। এবিষয়ে কিন্তু আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা কংগ্রেসের মধ্যে অধিকতর সহনশীলতা ও পরস্পরের মতের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করিতাম। সুভাষবাবুর বিবৃতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে

না হইলেই আমরা আনন্দিত হইতাম ; কিন্তু আসন্ন নির্ব্বাচন সম্পর্কে যখন আমরা দৃঢ় অভিমত পোষণ করি, তখন কোন কিছু না বলিলে আমাদের সুস্পষ্ট কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে।

মৌলানা সাহেব এই নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তিনি যখন প্রতিযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে কয়েকজনের সহিত পরামর্শ করিয়াই ডাঃ পট্টভির নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা মনে করি যে, খুব গুরুতর কোন কারণ না ঘটিলে বিদায়ী সভাপতিকে পুনরায় নির্ব্বাচন না করার নীতিই অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত।

সুভাষবাবু তাঁহার বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যই এ বিষয়ে একমত। প্রকৃতপক্ষে ইহাই কংগ্রেসের নীতি। তিনি আদর্শ, নীতি ও কার্য্যপদ্ধতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা মনে করি যে, কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে এই সমস্ত বিষয়ই প্রাসঙ্গিক নহে।

কংগ্রেসের নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি ইহার বিভিন্ন সভাপতিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে সভাপতির কার্য্যকাল এক বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

করা হইত না। কংগ্রেসের নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি যখন সমগ্র কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় না, তখন ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়। কংগ্রেসের সভাপতির যে মর্য্যাদা তাহা প্রকৃত-পক্ষে চেয়ারম্যানের মর্য্যাদার অনুরূপ। নিয়মতন্ত্রানুগ রাজতন্ত্রের অধীনে রাজা যেমন সমগ্র জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, ভারতের পক্ষে কংগ্রেসের সভাপতিও সেইরূপ। অতএব একান্ত সঙ্গতভাবেই এই পদপ্রাপ্তি পরম সম্মানজনক বিবেচিত এবং বার্ষিক নির্ব্বাচন দ্বারা ভারতমাতার কৃতী সন্তানগণের মধ্যে যথা-সম্ভব বেশীসংখ্যক লোককে এই সম্মান দানের চেষ্টা হইতেছে।

এই উচ্চ পদের মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বদাই এই নির্ব্বাচন সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে। কোনও প্রকার বাদ-বিতর্ক—এমন কি, নীতি ও কার্য্যপদ্ধতির খাতিরেও কোন প্রকার বিতণ্ডা এই ব্যাপারে বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা বিশ্বাস করি যে, ডাঃ পট্টভি কংগ্রেসের সভাপতি হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণতম সদস্যগণের অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে দেশসেবা করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাই কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের নিকট তাঁহার নির্ব্বাচনের জন্য সুপারিশ জানাইতেছি। সুভাষবাবুর সহকর্ম্মীরূপে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে এবং ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার নির্ব্বাচন সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে দিতে অনুরোধ করিতেছি।”

সর্দ্দার বল্লভভাই প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সাত জন সদস্যের উপরোক্ত বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা হইতে ২৪শে জানুয়ারী নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন ঃ—

"সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চ্যালেঞ্জের উত্তরে, আমাকে বাধ্য হইয়া এই বিবৃতি প্রকাশ করিতে হইতেছে। এই প্রকাশ্য বাদানুবাদ সুরু করিবার দায়িত্ব আমার বিশিষ্ট সহকর্ম্মীদের—আমার নহে। ওয়ার্কিং কমিটির এই দুইজন সদস্যের মধ্যে নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, কোন প্রার্থী এরূপ আশা করিবেন না যে, উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যেরা দল-বদ্ধভাবে প্রার্থীদের মধ্যে একজনের পক্ষাবলম্বন করিবেন, কেন না তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। সর্দ্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতারা যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবেই করিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে নহে। আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটি যখন ওয়ার্কিং কমিটিতে মোটেই আলোচিত হয় নাই, তখন এরূপ বিবৃতি প্রকাশ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কি?

এই বিবৃতি হইতে আমরা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম যে, বহু আলোচনার পর ডাঃ পট্টভির নির্ব্বাচন সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের কথা আমিও জানি না অথবা ওয়ার্কিং কমিটির কোন কোন সদস্যও জানেন না। এ সম্বন্ধে আমরা কোন আভাষ পাই নাই। আমার মনে হয়, এই বিবৃতিটি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য

হিসাবে না দিয়া ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস-সেবী হিসাবে ইঁহারা দিলেই ভাল করিতেন।

সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রকৃত নির্ব্বাচন-নীতি পালন করিতে হইলে কাহারও উপর কোনপ্রকার নৈতিক চাপ না দিয়া স্বাধীনভাবে ভোট দিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু এই বিবৃতি দ্বারা কি ভোটদাতাদের উপর নৈতিক চাপ দেওয়া হইতেছে না? সভাপতি যদি নির্ব্বাচন করিতে হয়, ওয়ার্কিং কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের দ্বারা যদি সভাপতি মনোনয়ন করা না হয়, তাহা হইলে সর্দ্দার বল্লভভাই প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ফতোয়া তুলিয়া লইয়া ভোটদাতাগণকে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে দিবেন কি? প্রতিনিধিদের ভোট দিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইলে নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না, নহিলে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রথা তুলিয়া দিয়া ওয়ার্কিং কমিটি সভাপতি মনোনয়নের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেই পারেন।

বিশেষ কারণ ব্যতীত একই ব্যক্তিকে সভাপতিপদে পুনর্নির্ব্বাচন করা উচিত নহে—একথা আমার নিকট নূতন। কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বহু ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একাধিকবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি নির্ব্বাচন সকল সময়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইয়াছে শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বহুক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে

অপরকে ভোট দিয়াছি বলিয়া আমার মনে আছে। মাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ এই নির্ব্বাচন সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইতেছে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নূতন গঠনবিধি গৃহীত হওয়ার পর হইতে সভাপতি নিজেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করেন। ঐ বৎসর হইতে কংগ্রেস-সভাপতির আসন আরও উচ্চ হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, কংগ্রেস-সভাপতি ও তাঁহার নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া নূতন প্রথা গড়িয়া উঠিবে।

বর্ত্তমানে কংগ্রেস-সভাপতির কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কোন সভার সভাপতির কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের অনুরূপ নহে। তাঁহার কার্য্য রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির কার্য্যের অনুরূপ। তিনি নিজেই নিজের মন্ত্রিসভা মনোনয়ন করেন; সুতরাং কংগ্রেস সভাপতিকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীন রাজার সহিত তুলনা করা সম্পূর্ণ ভুল। আমি একথাও বলিতে চাহি যে, নীতি এবং কর্ম্মতালিকার প্রশ্ন মোটেই অবান্তর নহে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে দক্ষিণ ও বাম উভয় পক্ষের সম্মতি ও সমর্থনক্রমে একজন বামপন্থীই বরাবর কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন বলিয়াই ঐ প্রশ্ন উঠে নাই; নতুবা বহুপূর্ব্বেই ঐ প্রশ্ন উঠিত। এই বৎসরে যে উক্ত প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং একজন দক্ষিণপন্থী প্রার্থীকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে। অনেকেই মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কংগ্রেসের দক্ষিণ-

পন্থীদের সহিত ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের একটা আপোষরফার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে। কাজেই দক্ষিণ-পন্থীরা একজন বামপন্থীর কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া পছন্দ করেন না—কেননা তিনি এই আপোষরফার অন্তরায় হইতে পারেন এবং আলোচনার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন। জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে এবং তাহাদের সহিত আলোচনা করিলেই বোঝা যায় যে, এই বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় মনে-প্রাণে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী একজন কংগ্রেস-সভাপতির প্রয়োজন।

সভাপতিপদের জন্য আমার নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় আমি সত্যই দুঃখিত হইয়াছি। এইজন্যই আমি বহুসংখ্যক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, আমার পরিবর্ত্তে বামপন্থীদের মধ্য হইতে একজন নূতন প্রার্থী দাঁড় করান উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ না করিয়া কয়েকটি প্রদেশ হইতে আমারই নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। এখনও যদি আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের ন্যায় একজন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বামপন্থীকে আগামী বৎসরের সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত করা হয়, তবে আমি নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান বৎসরের ন্যায় সঙ্কটকালে একজন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কংগ্রেস-সভাপতির নির্ব্বাচন অপরিহার্য্য। দক্ষিণপন্থীরা যদি প্রকৃতই জাতীয় ঐক্য চাহেন, তবে একজন বামপন্থীকে সভাপতি নির্ব্বাচন

করিতে রাজী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে। যে কোন উপায়েই হউক, একজন দক্ষিণপন্থী প্রার্থী দাঁড় করাইতে গিয়া তাঁহারা যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার সেই উদ্দেশ্যে, যিনি নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন একজন প্রার্থীকে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকেও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অশোভন আচরণে জনসাধারণের মনে অধিকতর সন্দেহ জন্মাইয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় সভাপতি নির্ব্বাচনও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামের অংশস্বরূপ। সুতরাং আমরা এই বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে পারি না। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে যাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা করিতে এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখিতে চাহেন, যিনি নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হইতে স্বেচ্ছায় প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন, তাঁহাকেই সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার জন্য জেদ করিয়া কংগ্রেসে ভেদ-বিরোধ সৃষ্টি করা তাঁহাদের কোনক্রমেই উচিত নহে।

সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিদের নিজস্ব অধিকার; সুতরাং তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেসে দলে ভারী রহিয়াছেন; এখন এই শেষ মুহূর্ত্তেও একজন বামপন্থী-প্রার্থীকে সমর্থন করিয়া বামপন্থীদের প্রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা তাঁহাদের উচিত। আমার এই আবেদন বৃথা হইবে না বলিয়াই আমি আশা করি।"

সুভাষচন্দ্রের উক্ত বিবৃতির উত্তরে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

বার্দ্দৌলী হইতে ২৫শে জানুয়ারী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :—

"এক সময়ে বার্দ্দৌলীতে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে ঘরোয়াভাবে আলোচনা হয়। এই আলোচনার সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, আচার্য্য কৃপালনী, মহাত্মা গান্ধী এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। তদুদ্দেশ্যেই এই বৈঠক হয় নাই, ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলাম। ইহা স্থির হয় যে, যদি কোন কারণে মৌলানা সাহেব উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে অবস্থানুযায়ী ডাঃ পট্টভিকেই রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচন করা ঠিক হইবে এবং সুভাষবাবুকে পুনর্নির্ব্বাচিত করা অনাবশ্যক বলিয়াই আমরা পরিষ্কার অভিমত জ্ঞাপন করি। বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থীর কথা আমাদের মনেও আসে নাই।

গতবৎসরে সুভাষবাবুর নিজের নির্ব্বাচনের সময় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল, এবারের নির্ব্বাচনকালেও সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে সেইবার অন্যান্য প্রার্থীদিগকে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য বাধ্য করিতে আমারা কোন বেগই পাই নাই।

মৌলানা সাহেব সম্মতি দিলেও বোম্বাই পৌঁছিয়া আবার তাঁহার মত বদলাইয়া যায়। এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার মনে উদয় হয়। তাঁহাকে এই

দায়িত্বভার গ্রহণ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য তিনি পুনরায় গান্ধীজীর নিকট ছুটিয়া যান। গান্ধীজীও আর মৌলানা সাহেবকে চাপ দেওয়া সম্মত বলিয়া মনে করেন নাই। তারপর কি হইয়াছে, দেশবাসী তাহা অবগত আছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতির কোন নীতি নির্দ্ধারণ কারবার ক্ষমতা আছে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমি একমত নহি। রাষ্ট্রপতিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ওয়াকিং কমিটির অভিমতই স্বীকৃত হইয়াছে এবং বড়ই গৌরবের বিষয় যে, রাষ্ট্রপতিগণও বরাবরই ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আমার সকল সহকর্ম্মী বার্দ্দোলীতে নাই এবং সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া অন্যান্য সহকর্ম্মীর অভিমত না লইয়াই আমি সুভাষবাবুর বিবৃতির জবাব দিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারেন। যাঁহাদের সহিত আমার এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে, তাঁহাদের এবং আমি এই সমস্যাকে ব্যক্তিগত এবং নীতিগত অথবা বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীর সমস্যা বলিয়া মনে করি না। দেশের স্বার্থরক্ষার বিবেচনাই অগ্রে স্থান পাইয়াছে। আমার মতে যাঁহারা এই সম্পর্কে বিবৃতি দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে পরিচালিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই সম্পর্কে উপদেশ চাহিয়া প্রতিনিধিদের নিকট হইতে প্রত্যহই তার ও পত্র আসিতেছে। আমি মনে

করি যে, অন্যান্য সহকর্ম্মিগণও এই প্রকার তার ও পত্র পাইতেছেন। এই অবস্থায় অধিকার কর্ত্তব্যও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি করিতে হইবে, তাহা বলা হইয়াছে। প্রতিনিধিগণ যাহা ভাল মনে করেন, সেইভাবেই ভোট দিতে পারেন—ইহা যখন সম্পূর্ণ তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে।"

বার্দ্দোলী হইতে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ২৫শে জানুয়ারী যে বিবৃতি প্রচার করেন তাহাতে তিনি বলেন :—

"এখন রাষ্ট্রপতির আসনের জন্য প্রতিযোগিতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এই সম্পর্কে সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিসমূহে জনসাধারণের সম্মুখে এমন কতকগুলি বিষয় প্রকট হইয়াছে যে, তৎসম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া আমি প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর গত ১৭ই জানুয়ারী আমি বার্দ্দোলী ত্যাগ করিয়া সেইদিনই সন্ধ্যায় বোম্বাই পৌঁছি। তখন আমি এই ধারণা লইয়া আসি যে, কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য মৌলানা আজাদকেই মনোনীত করা হইয়াছে। আমি বরাবর এই ধারণাই পোষণ করিয়াছি। এরূপ ধারণার একাধিক কারণ ছিল। কিন্তু রাত্রি ৭টায় বোম্বাইয়ে আমার বাড়ীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমার বাসায় টেলিফোনযোগে এক সংবাদ আসিয়াছিল, আমি বাড়ীতে পৌঁছিয়াই যেন টেলিফোন করি, উহাতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমাকে সেই অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি

তদনুসারে মৌলানা সাহেবকে ফোন করি। মৌলানা সাহেব আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন।

আমাকে ঐরূপ অনুরোধ করার উদ্দেশ্য আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমি তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া সেইদিন রাত্রেই ১০-২০ মিনিটের সময় মাদ্রাজ মেলে বোম্বাই ত্যাগ করার সঙ্কল্প করি। ইতিমধ্যে আমি মৌলানা সাহেবকে ফোন করি। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে কয়েকজন সাংবাদিক আমার নিকট আসিয়া বলেন যে,—কংগ্রেসের সভাপতি পদপ্রার্থী তিনজনের মধ্যে আপনি একজন।' মৌলানা সাহেব একজন প্রার্থী, ইহা আমি বিশেষভাবেই জানিতাম; তাঁহাকেই আমি সম্পূর্ণ যোগ্য মনে করিয়া প্রার্থীপদ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করি এবং তখনই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এক বিবৃতি দেই। আমারই সাক্ষাতে তাহা টেলিফোনযোগে প্রেরিত হয়।

তারপর আমি মৌলানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রওনা হই। আমি বেজওয়াদার টিকেট কাটি। আমি মৌলানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে জানাইয়া দেই যে,—আমি সভাপতি পদপ্রার্থী হইতে চাই না এবং সেই মর্ম্মে বিবৃতি দিয়াছি। মৌলানা সাহেব তখন বলেন, তিনিও প্রত্যাহার করিবেন এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি পর দিন প্রাতঃকালে বার্দ্দোলী যাইবেন। আমাকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করার জন্য মৌলানা সাহেব জিদ করিতে থাকেন। প্রথমে আমি তাঁহাকে নানা-

প্রকারে অনুনয় বিনয় করি। তিনি আমাকে নানা যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। যখন আমি তাঁহার সিদ্ধান্তের অকপট ঐকান্তিকতার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিলাম, তখনই আমি ফোন করিয়া প্রতিযোগিতা হইতে বিরত হওয়ার বিবৃতি প্রত্যাহার করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় আমি বোম্বাই ত্যাগ করি। গত ২১শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় মৌলানা সাহেব আমাকে তার করিয়া নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার সংবাদ দেন। আমি যাহাতে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতি হই, তিনি সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার নির্ব্বাচন প্রত্যাশা করার কারণ ছিল; কারণ, কিছুদিন হইতে দক্ষিণ ভারতের, বিশেষ করিয়া অন্ধ্রের, জনসাধারণ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করে যে, আগামী বৎসরের কংগ্রেস সভাপতি ঐ অঞ্চলের কোনও কংগ্রেস-কর্ম্মীকে করা হউক। অন্ধ্রের উপরই সকলের লক্ষ্য পতিত হয়। কিন্তু আমি বরাবর ইহার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছি।

সময়ের দাবী মিটাইতে সক্ষম প্রতিবৎসর এইরূপ এক ব্যক্তি কংগ্রেসের-সভাপতি হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে ন্যায্যভাবে সম্মান বণ্টনের প্রশ্ন, সভাপতি-মনোনয়নের সহিত জড়িত হওয়া উচিত নয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারী ব্যবসায় পরিত্যাগের পর আমি বরাবর সর্ব্বক্ষণের জন্য কংগ্রেসের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। দেশসেবার লক্ষ্যই আমাকে প্রেরণা দিয়াছে।

অন্তরের নিগূঢ়তম অংশেও আমি কখনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি নাই।

কিন্তু যখন মৌলানা সাহেব সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিভিন্ন দলের কংগ্রেসীদের মধ্যে আমার সম্পর্কে উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইল; আরও মৌলানা সাহেব নিবৃত্ত হইয়া আমার সাফল্য কামনা করিলেন এবং যখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মৌলানা সাহেবের সরিয়া দাঁড়াইবার পর ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্ম্মীদের অনেকেই আমাকে সমর্থন করিবেন, তখন আমার মনে হইল, কংগ্রেসের সভাপতিপদে আমার নির্ব্বাচন—দায়িত্ব গ্রহণের জন্য জনসাধারণের আহ্বান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সুতরাং সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে।

এক্ষণে প্রধান সমস্যা ও আলোচ্য সম্পর্কে আমি বিবৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি যে একজন অকপট গান্ধীবাদী, দেশের সকলেই তাহা জানেন। আমি এ সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা করিয়াছি এবং বহু পুস্তক লিখিয়াছি, যখন যে রাজনৈতিক সমস্যার উদয় হইয়াছে, তৎসম্পর্কেও আমার মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে নিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিপজ্জনক ব্যবস্থা জনসাধারণ্যে আমি অন্যের অপেক্ষা কম প্রচার করি নাই। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর এবং হরিপুরা কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, আমি যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলাম। ঐ সময় আমি ভারত শাসন আইন, (যাহা ভারত-

বাসীর স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে) খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করি। হরিপুরা কংগ্রেসের পর আমাকে কিছু সংযত হইতে হইয়াছে। আমি যতদূর জানি ও বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা উপলক্ষে ব্রিটাশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষরফা করিবার জন্য বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ওয়ার্কিং কমিটির কোনও সদস্যের নাই। সম্প্রতি আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে, বড়লাটের বিবৃতির তাৎপর্য্য কংগ্রেসের মনোভাব পরীক্ষা করা। কিন্তু কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের মনোভাব পূর্ব্বেই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। গত তিন বৎসর কাল আমি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারি না। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রয়োজন সত্য ; কিন্তু ব্রিটীশ জাতি যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের অবনতি ঘটিবে। দেশীয় রাজ্যে যে গণ-জাগরণের সূচনা হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হইবে।

আমি যদি সভাপতি নির্ব্বাচিত হই, তাহাকে আমি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে আমার সেবার পুরস্কার বলিয়া মনে করি। আমি অন্ধ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে কংগ্রেসীদের মধ্যে বহু অনাচার ও দুর্নীতি লক্ষ্য

করিয়াছি। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলে, আমি ঐ সকল দুর্নীতি দমনের চেষ্টা করিব।

একটা বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেটী এই—সুভাষবাবুর জন্য আমি কেন প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইব না। আমি তাহা পারি না, কেন-না আমার সহযোগী কর্ম্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া আমার উচিত নয়। জরুরী অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও সময়েই এক ব্যক্তিকে পর পর দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি করা যাইতে পারে না, আমি যদি আমার সহকর্ম্মীদের এই মত পোষণ না করিতাম, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া যাইতাম। বর্ত্তমানে সেরূপ জরুরী অবস্থা দেখা যায় না।”

এদিকে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যের যুক্ত বিবৃতিতে (২৪শে জানুয়ারী প্রদত্ত) ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়; নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

যুক্তপ্রদেশের রাজস্বসচিব মিঃ রফি আহম্মদ কিদওয়াই বলেন ঃ—

“সর্দ্দার প্যাটেল এবং ওয়ার্কিং কমিটির অপর কতিপয় সদস্যের বিবৃতি পাঠ করিয়া আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরিয়া দাঁড়াইবার পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতি হয়ত ভাল হইয়াছে, হয়ত বা খারাপ

হইয়াছে, কিন্তু সর্দ্দার প্যাটেল ও তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটির সহ-কর্ম্মীদের পক্ষে শ্রীযুক্ত বসুর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বিবৃতি দেওয়া নিশ্চয়ই সঙ্গত হয় নাই।

সর্দ্দার প্যাটেলের মতে ওয়ার্কিং কমিটিই কংগ্রেসের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করেন এবং সভাপতি নামে মাত্র নেতা। কিন্তু তিনি বেশ সুবিধাজনকভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি সভাপতিরই সৃষ্টি—উহার সদস্য নিয়োগ তাঁহার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শ্রীযুক্ত বসু উভয়েই নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে ওয়ার্কিং কমিটিতে মনোনীত করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন এবং অদ্যকার এই ব্যবস্থা সেই দুর্ব্বলতারই ফল। আমি প্রার্থীদ্বয়ের গুণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না; কিন্তু আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের প্রচারিত বিবৃতির দ্বারা মতামত স্থির না করিবার জন্য প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করিতে চাই। বিবৃতিটির প্রকৃত অর্থ তাঁহারা যেন অনুধাবন করেন। ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া অথবা শ্রীযুক্ত বসুকে ভোট দিবার প্রকৃত অর্থ হইবে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ অথবা বর্জ্জনের পক্ষে ভোট দেওয়া।”

শ্রীযুক্ত নরীম্যান বলেন ঃ—“কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রমতে প্রতিনিধিগণের যদি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে প্রতিনিধিদের স্বাধীন-

ভাবে ভোট দিতে দেওয়া উচিত। আমরা আশাকরি, দেশের সকল স্থানের প্রতিনিধিগণ কোন প্রকার ভয় বা অনুগ্রহ না করিয়া তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

ডাঃ খারে বলেন ঃ—"কংগ্রেস কর্ত্তৃক এদেশের সর্ব্বত্র প্রভুত্ব বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও যে পট্টভি নিজের মিউনিসিপ্যাল সহর ও জেলা বোর্ডকে নিজের অনুগত রাখিতে পারেন নাই, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার কোন তুলনা হয় না। যে ডাঃ পট্টভি নিজের সহরে জাষ্টিস পার্টির সম্মুখীন হইতে পারেন নাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হইবেন একথা কেমন করিয়া আপনারা আশা করেন? অতএব আপনারা যদি সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা আনিতে চাহেন, তবে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ভোট দিন। তাহা হইলে গণতন্ত্র ও স্বরাজকে ভোট দেওয়া হইবে।"

মিঃ মাসানী ও মিঃ মেহের আলি তাঁহাদের বিবৃতিতে বলেন ঃ—

"দেশের সর্ব্বত্র প্রতিনিধিরা যে নির্ব্বাচন করিবেন তাহা রাজনৈতিক—ব্যক্তিগত নহে। এই নির্ব্বাচনে প্রাদেশিকতার ছাপও নাই। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, সভাপতি পদে শ্রীযুক্ত বসুর নির্ব্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জনমতের অটল বিরোধিতা এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে সংগ্রামশীল কার্য্যপদ্ধতির সমর্থন ঘোষণা করিবে। এই জন্য আমরা শ্রীযুক্ত

বসুকে পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য ভোট দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।"

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সাতজন সদস্যের পক্ষে শ্রীযুক্ত বসুর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া এত ক্ষুদ্রজনোচিত, হীন ও অশোভন হইয়াছে যে, কংগ্রেসের ইতিহাসে ইহার তুলনা বিরল।

দিনাজপুরের প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেন যে, বিদায়ী সভাপতি নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলে তাহার বিরোধিতা না করার নীতি প্রবর্ত্তন করা উচিত।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ২৫শে জানুয়ারী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :—

"আমার সহকর্ম্মী ওয়ার্কিং কমিটির মোট সাতজন সদস্য ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিপুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে ঐ সম্পর্কে বিনা সঙ্কোচে আমার মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। গতকল্য ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমার কোন সহকর্ম্মী এই প্রকার বিবৃতি প্রচার করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিতাম না। এই প্রকার বিবৃতি সম্পর্কে আমার সর্ব্বপ্রথম আপত্তি এই যে, ওয়ার্কিং কমিটির কোন

সদস্যের পক্ষেই তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের নির্ব্বাচনমূলক প্রতিযোগিতায় কোন পক্ষ অবলম্বন করা উচিত নহে। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে অধিকতর সংহতি রক্ষা, পরস্পরের মতের প্রতি অধিকতর সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা অবলম্বন করা দরকার বলিয়া সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারিগণ তাঁহাদের বিবৃতিতে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে আমি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত ; কিন্তু তাঁহাদের বিবৃতিতেই তাঁহাদের স্ব স্ব মত পালিত হয় নাই বলিয়া আমি দুঃখিত। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত প্রতিনিধিদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপরেই কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রশ্ন একান্তভাবে নির্ভর করে। ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্য কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিবিশেষকে সুপারিশ করিয়া মতামত ব্যক্ত করা নির্দ্দেশেরই অনুরূপ ; ইহা পালনের জন্য পরোক্ষে সকলকে বলা হয়। আমার মনে হয়, ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের কোন বিষয়ে কোন দলের পক্ষাবলম্বন করা উচিত নহে, যদ্দ্বারা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বপূর্ণ নির্দ্দেশের আভাষ থাকিতে পারে। উপসংহারে, সর্দ্দার প্যাটেল এবং আমার মধ্যে যে তার-বিনিময় হইয়াছে, তাহার অনুলিপি দিয়া আমি আমার বিবৃতি সম্পূর্ণ করিব।

(২৩।১।৩৯ তারিখে রাত্রি ১টায় প্রাপ্ত) :—

সভাপতি নির্ব্বাচনে সুভাষবাবুর বিবৃতির উত্তরে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দের পাল্টা বিবৃতি দেওয়া দরকার মনে

করিতেছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচন প্রয়োজন মনে করেন না। সংক্ষিপ্ত একটি বিবৃতি প্রস্তুত আছে। ঐ বিবৃতির মর্ম্ম এই যে, একমাত্র বিশেষক্ষেত্রে পুনর্নির্ব্বাচন হওয়া উচিত। কিন্তু সুভাষবাবুর পুনর্নির্ব্বাচন সম্পর্কে ঐরূপ প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। সুভাষবাবু যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস কিম্বা ওয়ার্কিং কমিটিই কংগ্রেসের কার্য্যক্রম এবং নীতি স্থির করেন—কংগ্রেস সভাপতি তাহা করেন না। পাল্টা বিবৃতিতে ডাঃ পট্টভিকে নির্ব্বাচনের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস সভাপতির নির্ব্বাচন ব্যাপারে কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করিতে সুভাষবাবুকে অনুরোধ করা হইয়াছে—বল্লভভাই।

(২৪।১।৩৯ তারিখে সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট প্রেরিত) ঃ—

অদ্য প্রাতে তার পাইলাম। শ্রীহট্ট যাইবার পথে মৌলানা এবং সুভাষের বিবৃতি পাঠ করিয়াছি। মৌলানার নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পর ডাঃ পট্টভিকে দাঁড় করান বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমি মনে করি না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আগামী বৎসর সব দিক দিয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সঙ্কটজনক। সহ-কর্ম্মীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্যেরই কোন পক্ষ অবলম্বন করা মোটেই উচিত নয় বলিয়া মনে করি। আপনার প্রস্তাবিত বিবৃতির ফলে দক্ষিণ এবং

বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। ঐ প্রকার বিরোধ এড়ানই সঙ্গত। আগামী সংগ্রামে ডাঃ পট্টভি দেশ-বাসীর আস্থাভাজন হইতে পারিবেন না। দয়া করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ আনয়ন করিবেন না—শরৎ বসু।

(২৪।১।৩৯ তারিখে প্রাপ্ত) ঃ—

আপনার টেলিগ্রামের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান বিবৃতি প্রদান করিতে বাধ্য করিল। মতভেদ ব্যক্তি-সম্পর্কে নয়—নীতি সম্পর্কে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে আশা করি, তাহাতে তিক্ততার সৃষ্টি হইবে না কিম্বা কোনরূপ দুরভিসন্ধির অভিযোগ করা হইবে না। পুনর্নির্ব্বাচন দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করা যাইতেছে—বল্লভভাই।

(২৫।১।৩৯ তারিখে সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট প্রেরিত) ঃ—

গত রাত্রিতে আপনার তার পাইলাম। প্রাতের পত্রিকা-গুলিতে আপনার এবং ওয়ার্কিং কমিটির অপর ছয় জন সদস্যের বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে ; আমাদের মধ্যে যে তার-বিনিময় হইয়াছে, অদ্য সন্ধ্যায় সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশার্থ প্রেরণ করিতে চাই। আশা করি, কোন আপত্তি নাই—শরৎ বসু।

(২৫।১।৩৯ তারিখে প্রাপ্ত) ঃ—

"প্রকাশে কোন আপত্তি নাই—বল্লভভাই।"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ২৬শে জানুয়ারী আলমোড়া হইতে

এক বিবৃতি প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি পরোক্ষে ডাঃ সীতারামিয়ার পক্ষ সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা হইতে ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশিত তাঁহার বিবৃতিতে বলেন ঃ—

"ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমাকে পুনরায় বাধ্য হইয়া এই প্রকাশ্য বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ডাঃ সীতারামিয়া বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতের, বিশেষ করিয়া অন্ধ্রদেশের জনসাধারণ একবাক্যে একজন অন্ধ্রবাসী কংগ্রেসের পরবর্ত্তী সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হউন, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতের কোন অংশের কংগ্রেসকর্ম্মীরা এতটা প্রাদেশিক ভাবাপন্ন হইবেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। অধিকন্তু অন্ধ্রদেশ হইতে স্বেচ্ছায় আমাকে সমর্থন করিতে চাহিয়া অনেকেই আমার নিকট তার প্রেরণ করিয়াছেন। আর তামিল-নাড়ুর অবস্থা এই যে, সেখানকার বন্ধুরাই প্রতিনিবৃত্ত না হইবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

সর্দ্দার প্যাটেলের বিবৃতিতে একটি অনিষ্টকর স্বীকারোক্তি স্থান পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য কোন গুরুতর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি বা ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্য যে এবিষয়ে কিছুই

জানেন না, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি এমন একজন সভাপতি চাহেন, যিনি নামে সভাপতি হইলেও কার্য্যতঃ ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইবেন। ওয়ার্কিং কমিটি প্রকৃতপক্ষে কয়েক-জন সদস্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং অপর সদস্যেরা তাঁহাদেরই অনুকম্পাবলে ওয়ার্কিং কমিটিতে রহিয়াছেন—এই প্রচলিত ধারণা, উপযুক্ত স্বীকারোক্তিতে সমর্থিত হইতেছে।

কংগ্রেসের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রস্তাবে সর্ব্বতোভাবে উহার বিরোধিতা করিবার অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, কোন কোন প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস-নেতা গোপনে এবং প্রকাশ্যে সর্ত্তাধীনভাবে উহা গ্রহণ করিবার পক্ষে ওকালতি করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত দক্ষিণপন্থী নেতাদের পক্ষ হইতে এরূপ কার্য্যের নিন্দা করিয়া বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় নাই। চক্ষু মুদিয়া প্রকৃত অবস্থায় উদাসীন থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আগামী বৎসরের মধ্যেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের একটা বোঝাপড়া হইয়া যাইবে—দেশবাসীর মনে এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? এ ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু এ ধারণা যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে—সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রি-

সহিত আমার সম্বন্ধ হৃদ্যতাপূর্ণ ই ছিল ; মোটামুটিভাবে ওয়ার্কিং কমিটিতে আমাদের কাজকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। আমার পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য কংগ্রেসকর্ম্মীদের ইচ্ছা ছিল ; সেই অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য কেন আমার বিরোধী হইয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কাহারও মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমি উক্ত সদস্যদের হাতের পুতুল হইব না—এই জন্যই কি তাঁহারা আমার বিরোধী ? অথবা তাঁহারা কি আমার মতবাদ ও আদর্শের বিরোধী ? আমার নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। কথিত হইয়াছে, কেবলমাত্র বিশেষক্ষেত্রে পুনর্নির্ব্বাচন সম্ভবপর। ইহার উত্তরে স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারে যে, পুনর্নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রে কোন বিধান নাই। কংগ্রেসের কয়েকজন প্রাক্তন সভাপতি একাধিকবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী বৎসর এইরূপ বিশেষক্ষেত্রের উদ্ভব হইবে এবং আমাকে পুনর্নির্ব্বাচিত করার ইচ্ছাই সকলের ছিল।

সর্দ্দার প্যাটেল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট যে তার পাঠাইয়াছেন, উহাতে এই মর্ম্মে আর এক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আমার পুনরায় নির্ব্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। এই যুক্তি এরূপ বিস্ময়কর যে, ইহার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক। যদি ঐ সমস্ত নেতা তাঁহাদের প্রভাব আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করিতেন এবং আমার নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে

অনুজ্ঞা প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের যথার্থ অভিমত জানিতে পারিতাম এবং ঐ অভিমত সর্দ্দার প্যাটেলকে বিস্ময়ে অভিভূত করিত।

এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে বলিয়া যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক। তবে গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই; একথাও সত্য যে, এই বৎসরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্য ধরণের। পূর্ব্বেও নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচনে ওয়ার্কিং কমিটির একটি দল যে প্রভুত্ব করিবেন, এইরূপ দাবী তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রকৃতরূপে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে স্বাধীনচিত্ত ও প্রভাবমুক্ত হইয়া প্রতিনিধিবর্গের সভাপতি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভোট প্রদান সম্পর্কে প্রতিনিধিবর্গের নিকট কেবল নির্দ্দেশ প্রেরিত হয় নাই, তাঁহাদের উপর নৈতিক চাপও দেওয়া হইতেছে।

সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, গত বৎসর যে পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান বৎসরেও তাহাই করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা মোটেই সত্য নহে। ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতাশালী দল যদি ন্যায়সঙ্গত মনোনয়ন করিতেন, তাহা হইলে এই বৎসরও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত না। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব যদি জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে কি প্রতিনিধিবর্গকে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করিবার সুযোগ দেওয়া

হইবে না? এই স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহা হইলে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র গণতান্ত্রিক থাকিবে না। প্রতিনিধিবর্গ নিজেদের ইচ্ছামত ভোট প্রদান করিতে না পারিলে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক নিয়মতন্ত্র থাকার আবশ্যকতা কোথায়?

গণতন্ত্রের প্রশ্ন ব্যতীত বর্ত্তমান নির্ব্বাচন সমস্যার সহিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও জড়িত রহিয়াছে। আমরা যদি কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করিতে চাই এবং বাম ও দক্ষিণপন্থি-গণ যদি সম্মিলিতভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সভাপতির উপর উভয় পক্ষের বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উপর এরূপ বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় ছিল এবং বিনীতভাবে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমিও অন্ততঃপক্ষে কিছুটা বিশ্বাস লইয়া কাজ করিয়াছি। এই জন্যই কংগ্রেসকর্ম্মিবৃন্দের সহিত আমি দাবী করিতেছি যে, আন্তরিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী এবং বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় দলের আস্থাভাজন এমন এক ব্যক্তিকে আমরা আগামী বৎসরের কংগ্রেস সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাই। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আসন্ন সংগ্রামের জন্য ইহা অত্যাবশ্যক নহে, পরন্তু দক্ষিণপন্থী কোন কোন নেতার অভিপ্রায় সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও ইহা অত্যাবশ্যক।

মোটের উপর বর্ত্তমান বৎসরের কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন

ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—একটি হইল গণতন্ত্রের মর্য্যাদা, অপরটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিধাহীন বিরোধিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন কিছুই নাই এবং আমি প্রতিনিধিগণকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি ঘটনাচক্রে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছি; কারণ, বামপন্থিগণের মধ্য হইতে কেহ নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হন নাই। এখনও যদি দক্ষিণপন্থীরা একজন বামপন্থী বা বামপন্থীদের শ্রদ্ধাভাজন একজনকে সভাপতিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ান যাইতে পারে; আমি একাধিকবার ইহা বলিয়াছি। যদি শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা হয় (এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ইহা অনিবার্য্য বলিয়াই মনে হয়), তাহা হইলে কংগ্রেসকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দক্ষিণপন্থীদের উপরেই পড়িবে। তাঁহারা কি সেই দায়িত্বই গ্রহণ করিবেন, না প্রগতিমূলক কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।"

ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষ সমর্থন করেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের জাতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত এম এস আনে, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের বিবৃতিতে প্রতিনিধিদের ভোটাধিকারে হস্তক্ষেপ না করিবার বিষয় উল্লেখ করেন। ২৭শে জানুয়ারী পাটনা হইতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বিবৃতি

প্রচার করেন, তাহাতে তিনি বলেন—'প্রতিনিধিগণ ডাঃ সীতারামিয়ার পক্ষে ভোট দিলেই যে তাঁহারা স্বাধীনভাবে ভোট দিবেন না, এমন অভিযোগ অসঙ্গত।' ইহা হইতে বুঝা যায়, ওয়ার্কিং কমিটির সপ্তরথী সুভাষ-নিধনকার্য্যে কিরূপ অগ্রণী হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া মহাত্মা গান্ধী ১৯শে জানুয়ারী বার্দ্দৌলী হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২৯শে জানুয়ারী রবিবার (১৫ই মাঘ, ১৩৪৫ সাল)—ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব লইয়া যে কলহের উদ্ভব হইয়াছে, আজ উহার নিষ্পত্তি হইবে। ভারতব্যাপী এক উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার দিকে ঐ উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। অলিতে-গলিতে, রাজপথের মোড়ে মোড়ে উৎকণ্ঠিত মানবের বিপুল সমাবেশ। সংবাদপত্রসমূহের অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইতে না হইতেই নিঃশেষিত হইতে লাগিল। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় জনসাধারণের প্রত্যয় জন্মিল—সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ সুনিশ্চিত।

৩০শে জানুয়ারী সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতেই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল সুভাষচন্দ্রের বিজয়-বার্ত্তা। সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে

গর্ব্বান্ধ উপদলীয় প্রভুত্ব, সুখসাধ্য রাজনীতি-বিলাস ও সর্ব্বজন-নিন্দিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাকে ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইবার গোপন চক্রান্ত পর্য্যুদস্ত হইল। অধিকাংশ প্রতিনিধির ভোট লাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সুভাষচন্দ্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ সীতারামিয়ার পরাজয়ে কংগ্রেসের 'হাই কমাণ্ড-'এর পরাজয় হইল। প্রাচীন ভারতে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যু বধ হইয়াছিল। কিন্তু নবতম জাগ্রত ভারতে সর্দ্দার প্যাটেল প্রমুখ সপ্তরথীর ঘোষণাপত্র ও বিরুদ্ধাচরণের বিপক্ষে জয়ী হইয়াছেন সুভাষচন্দ্র। ওয়ার্কিং কমিটির কর্ত্তৃত্বলিপ্সু সপ্তরথীর অনধিকার চর্চ্চা ও গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপ সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের প্রধান কারণ। কেন্দ্রীয় পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের ভাষায় বলিতে হয়—'শ্রীযুক্ত বসুর জয়লাভ গভীর অর্থসূচক। কংগ্রেসের ইতিহাসে ইহা নূতন যুগের আবির্ভাব সূচনা করিয়াছে। ইহা বামপন্থী ও কংগ্রেসের উপরওয়ালার প্রবল শক্তি হ্রাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই জয় প্রবীণের বিরুদ্ধে নবীনের জয়লাভ এবং ইহার আবেশে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার শেষ পরিণতি স্থির হইবে। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিকতা ও মোলায়েম নীতির পথ রুদ্ধ হইবে এবং জাতি আবার সংগ্রামের পথে পরিচালিত হইবে। আমি ভারত সরকার ও ইংরাজ সরকারকে এই নির্ব্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বলি।'

বিভিন্ন প্রদেশের মোট প্রতিনিধি সংখ্যা এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার মধ্যে কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	প্রদেশ	প্রতিনিধি সংখ্যা	বসুর পক্ষে	সীতারামিয়ার পক্ষে
১।	বাঙ্গালা	৫৪৪	৪০৪	৭৯
২।	উৎকল	১৪৯	৪৪	৯৯
৩।	যুক্তপ্রদেশ	৪৯৭	২৬৯	১৮৫
৪।	তামিলনাড	২২৬	১১০	১০২
৫।	পাঞ্জাব	২৮৫	১৮২	৮৬
৬।	কেরল	১০১	৮০	১৮
৭।	বিহার	৩২৩	৭০	১৯৭
৮।	গুজরাট	১১৫	৫	১০০
৯।	দিল্লী	×	১০	৫
১০।	ব্রহ্ম	×	৮	৬
১১।	বিদর্ভ (বেরার)	৩৫	১১	২১
১২।	অন্ধ্র	২৫১	২৮	১৮১
১৩।	আজমীঢ় মাড়োঃ	৫২	২০	৬
১৪।	আসাম	৬০	৩৪	২২
১৫।	বোম্বাই	×	১২	১৪
১৬।	নাগপুর	৩১	১২	১৭
১৭।	কর্ণাটক	১৬৩	১০৬	৪১
১৮।	মহাকোশল	১৪৭	৬৭	৬৮
১৯।	মহারাষ্ট্র	১৭৪	৭৭	৮৬
২০।		৫৩	১৩	২২
২১।	সিন্ধু	৩৯	১৩	২১
			১৫৭৫	১৩৭৬

কে কে একাধিকবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

(১) মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি—১৮৮৫ (বোম্বাই) এবং ১৮৯২ (এলাহাবাদ)। (২) স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ—১৮৮৯ (বোম্বাই) এবং ১৯১০ (এলাহাবাদ)। (৩) মিঃ দাদাভাই নৌরজী—১৮৯৩ (লাহোর) এবং ১৯০৬ (কলিকাতা)। (৪) স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি—১৮৯৫ (পুণা) এবং ১৯০২ (আমেদাবাদ)। (৫) স্যার রাসবিহারী ঘোষ—১৯০৭ (সুরাট) এবং ১৯০৮ (মাদ্রাজ)। (৬) পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য—১৯০৯ (লাহোর) এবং ১৯১৮ (দিল্লী)। (৭) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু—১৯১৯ (অমৃতসর) এবং ১৯২৮ (কলিকাতা)। (৮) পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু—১৯২৯ (লাহোর), ১৯৩৬ (লক্ষ্ণৌ) এবং ১৯৩৭ (ফৈজপুর)। (৯) শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—১৯৩৮ (হরিপুরা) এবং ১৯৩৯ (ত্রিপুরী)।

একুশ

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পরে

সর্দ্দার প্যাটেল প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী সদস্যবৃন্দের প্রবল বিরোধিতা ও চক্রান্ত সত্ত্বেও পুনর্ব্বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের নিকট ভারতের সর্ব্বত্র হইতে অভিনন্দন-জ্ঞাপক তার আসিতে থাকে। বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তখন সুভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা চলিতে থাকে। ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নাগরিকবৃন্দের এক

বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করা হয়। অভি-নন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন :—"আমার জয়লাভে নীতি ও আদর্শের জয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের কথা আসে না।" ঐ দিন (অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী, সোমবার) রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে তিনি বলেন :—

"ভারতের স্বাধীনতা লাভের শত্রুরা হয়ত এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন যে, এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সূচিত হইতেছে। কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে সকলকে জানাইয়া দিতেছি যে, কংগ্রেস পূর্ব্বের ন্যায়ই ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে—কোন দলাদলি ঘটিতে পারে নাই ; কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁহারা সকলেই একমত। দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিবর্গের ঐক্য ও সংহতি বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। যাহাতে সেই ঐক্য ও সংহতি পরোক্ষভাবেও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন কোন কাজ করা বা কথা বলা আমাদের পক্ষে উচিত নয়।"

৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী দুই দিন মালদহ জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র কলিকাতা হইতে মালদহ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনে একটি মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উহাতে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী উপস্থিত করা হয়। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের জলপাইগুড়ি অধিবেশনেও যোগদান করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের পরে সমগ্র ভারত যখন উল্লাসে মগ্ন, তখন বার্দ্দোলী হইতে মহাত্মা গান্ধী সত্য, অহিংসা, আদর্শ ও নীতি বিসর্জ্জন দিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন :—

"শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুস্পষ্টরূপেই জয়লাভ করিয়াছেন। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোড়া হইতেই আমি তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। ইহার কারণ এস্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্ব্বাচনী প্রচারপত্রে তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি না। আমি মনে করি যে, সমকর্ম্মীদের কথা তিনি যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে। তথাপি তাঁহার জয়লাভে আমি আনন্দিত। মৌলানা সাহেব তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক। আমি যদি সুস্পষ্ট নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে না পারি তবে আমার কোনই মূল্য নাই। অতএব আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও কার্য্যপদ্ধতির পরিপোষক, ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন করেন না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা হইতে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের বাহির হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে আমি যাহা প্রচার করিয়াছিলাম, সেই নীতি অনুসারে কাজ করিবার পক্ষে এখন আমার একটা সুযোগ হইয়াছে। সুভাষবাবু যাঁহাদিগকে দক্ষিণপন্থী বলেন, এখন তিনি তাঁহাদের অনুগ্রহে সভাপতি না হইয়া প্রতিযোগিতামূলক নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত সভাপতি। ইহার ফলে তিনি একমতাবলম্বী সদস্যগণ দ্বারা গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন এবং বিনা বাধায় তাঁহার রচিত কর্ম্মপন্থা অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু এই উভয় দলের মধ্যে একটা বিষয়ে মতের মিল আছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার জন্য উভয় দলই আগ্রহশীল। 'হরিজন'-এ আমার যে সব লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, কংগ্রেস অতি দ্রুত একটা দুর্নীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে—অর্থাৎ কংগ্রেসের খাতার মধ্যে বহু সংখ্যক ভুয়া সদস্যের নাম রহিয়াছে। বিগত কয়েক মাস ধরিয়া আমি এই সকল খাতা বিশেষ করিয়া সংশোধনের প্রস্তাব করিতেছি। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সকল ভুয়া ভোটারের ভোটে নির্ব্বাচিত বহু সদস্যই পরীক্ষার ফলে অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

কিন্তু আমি এখন সেইরূপ কোন কঠোর পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করি না। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের খাতাগুলি হইতে যদি

সমস্ত ভূয়া সদস্যের নাম কাটিয়া দেওয়া হয় এবং প্রবঞ্চনার পথ রোধের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান কার্য্যক্রমের উপর যদি তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে, তাঁহারা সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরু যাহাই হউন না কেন, এমন কি তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে অথবা বাহিরে যেখানেই থাকুক না কেন, এই কার্য্যক্রম অনুসারে কাজ করা চলিবে। কংগ্রেসের এই পরিবর্ত্তনের ফলে একমাত্র পার্লামেণ্টারী কার্য্যক্রমই সম্ভবতঃ প্রভাবিত হইবে।

এতদিন যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রিদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যক্রম স্থির করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যক্রমের মধ্যে পার্লামেণ্টারী কার্য্যক্রম একটা অপ্রধান বিষয় মাত্র; অবশ্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। যদি কোন বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি অনুসারে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলা হয়, কিম্বা যদি তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একমত হইতে না পারিয়া পদত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু যায় আসে না।

হাজার হোক, সুভাষবাবু ত আর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যক্রম এবং নীতিকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক মনে করেন।

যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁহারা কেবলমাত্র উহার সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাঁহারা যদি উহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাল রাখিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন; কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উচিত হইবে না। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন তখন তাঁহারা সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসসেবিগণকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের বাহিরে থাকেন, তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সুতরাং যাঁহারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করিবেন তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারেন। তাঁহারা কোন প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া বাহির হইবেন না; কার্য্যকরীভাবে দেশের অধিকতর সেবা করার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা বাহিরে আসিবেন।"

ক্ষোভোক্তিপূর্ণ এই বিবৃতির উত্তরে যখন মহাত্মাজীর উপর ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অজস্র নিন্দাবর্ষণ সুরু হইল, সুভাষচন্দ্র কলিকাতা হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারী নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন :—

"সম্প্রতি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, আমি সবিশেষ মনোযোগ-

সহকারে তাহা পাঠ করিয়াছি। নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয়কে মহাত্মা গান্ধী স্বকীয় পরাজয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমি এই বিষয়ে তাঁহার সহিত ভিন্নমত হইতে চাই। ভোটদাতাগণ অর্থাৎ প্রতিনিধিগণ মহাত্মা গান্ধীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ হন নাই। অতএব আমার এবং অধিকাংশ লোকের মতে, নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার জয় পরাজয়ের প্রতীক নহে।

কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণপন্থীদের লইয়া কয়েকদিন যাবৎ অনেকে অনেক কিছু বলাবলি করিয়াছেন, সংবাদপত্রেও অনেক কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে সভাপতি নির্ব্বাচনের ফলকে বামপন্থীদের জয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। আমার বক্তব্য এই যে, এই নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যেন আমরা অতিরিক্ত কল্পনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করি বা অতিরিক্ত রং ফলাইয়া না ফেলি। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে নির্ব্বাচনব্যাপারে বামপন্থিগণেরই জয় হইয়াছে, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে আমাদিগকে বামপন্থিগণের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। বামপন্থিগণ কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দায়িত্ব স্কন্ধে লইবেন না। যদি বিভেদের সৃষ্টিই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্যই যে ঐরূপ হইবে

তাহা নহে, বিভেদ নিবারণে তাঁহারা চেষ্টা করিলেও বিভেদের সৃষ্টি হইবে।

কংগ্রেসের মধ্যে দলগত বিরোধের যে ধূয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোন যুক্তি ও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবু যদি কোনদিন এইরূপ কোন বিরোধ অনিবার্য্যই হইয়া উঠে তবে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে আমি এই কথাই বলিতে চাই যে, আমাদের নির্ব্বাচন-প্রতিশ্রুতি ও পার্লামেণ্টারী কার্য্যসূচী আমরা ভবিষ্যতে অধিকতর যত্নের সহিত সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিব। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য এবং পূর্ণ স্বরাজের পথে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়াই আমরা আমাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইব।

এই সম্পর্কে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মহাত্মাজীর সহিত আমার মতানৈক্যের জন্য আমি গভীর বেদনানুভব করিতেছি। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বের নিকট সর্ব্বদাই আমি আমার মস্তক আনত করিতে গৌরবানুভব করিব। আমার সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী কিরূপ মত পোষণ করেন, তাহা আমি জানি না; কিন্তু তাঁহার মতামত যাহাই হউক না কেন, তাঁহার বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য আমি সর্ব্বদা সচেষ্ট

থাকিব। অন্যান্য সকলের আস্থা অর্জ্জন করিয়াও আমি যদি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইবে।"

মহাত্মাজীর বিবৃতির পর হইতে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহাতে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নানারূপ বিবৃতির দ্বারা সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলিকে পূর্ণ করিতে থাকেন। মহাত্মার বিবৃতির সূত্র ধরিয়া দক্ষিণপন্থী সদস্যবৃন্দের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির সংশ্রবত্যাগের জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, শেষ মুহূর্ত্তে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় এই জাতীয় সঙ্কটের নিরসন হইবে—দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ২২শে ফেব্রুয়ারী বুধবার ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য এক-যোগে পদত্যাগ করিয়া সকল সংশয় সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর বিনা উপদেশে যে তাঁহারা এরূপ করেন নাই, তাহা মহাত্মাজী নিজেই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র যেন তাঁহার সহযোগিতা ও সাহায্যের আশা না করেন। বহু নেতা ব্যক্তি-গতভাবে এবং বিভিন্ন দল ও উপদলের পক্ষ হইতে কংগ্রেসকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবেদন নিবেদন করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে।

দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সহিত অসহযোগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প ; তাঁহাদের সেই সঙ্কল্প তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশিত হইবার পর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় কিনা দেখিয়া তাঁহারা পদত্যাগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবেন, ত্রিপুরীর অধিবেশনের পূর্ব্বে তাহার কারণ ঘটিবে না। কিন্তু ধৈর্য্যধারণ করাও আর তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। যে সময় সুভাষচন্দ্র পীড়িত এবং তাঁহার অসুস্থতা উদ্বেগের কারণ হইয়াছে, সেই সময় কংগ্রেসে তিনি কার্য্যপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন তাহা না জানিয়াই বার জন সদস্যের এই পদত্যাগ যে অশোভন হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা মনে করেন নাই।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির অপর এগার জনের পদত্যাগ পত্রের মর্ম্ম ঃ—

প্রিয় সুভাষ,

আপনার অসুস্থতার সংবাদে আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত। আপনার স্বাস্থ্যের এই অবস্থায় আপনার ওয়ার্দ্ধা আসিবার কথা উঠিতেই পারে না। আশা করি, শীঘ্রই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন। বর্ত্তমান ঘটনাবলীর বিষয় বিশেষ সতর্কতার সহিত আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি ; সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে আপনি যে সকল বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহাও পড়িয়া দেখিয়াছি। আপনার অসুস্থতা এবং তাহার ফলে আমাদের সভা স্থগিত রাখিতে হওয়ায় আপনার বিবৃতিগুলি সম্পর্কে আমরা মতামত

জ্ঞাপন করিতে পারিলাম না। বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া এতদ্বারা ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিতেছি। আমাদের মনে হয়, আপনার মনোমত কর্ম্ম-পরিষদ গঠনে আপনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াই কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের আপোষ-নিষ্পত্তির ভিত্তির উপর রচিত কোন কর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তে কংগ্রেসের একটা সুস্পষ্ট কর্ম্মনীতি অনুসরণের সময় আসিতেছে। এজন্য আপনার নিজ মতানুবর্ত্তীদের মধ্য হইতে আপনার নিজ কর্ম্ম-পরিষদের সদস্যগণকে বাছাই করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আপনি দেশের জন্য যে কর্ম্মনীতি রচনা করেন, উহার যে যে স্থলে আমাদের সহযোগিতা করা সম্ভব, আমরা সেই সেই স্থলে আপনার সহিত সহযোগিতা করিব। সাধারণ্যের উদ্বেগের নিরসনকল্পে আমরা এই পদত্যাগপত্র সাধারণ্যে প্রচার করিতেছি। ইতি

ভবদীয়—

(স্বাঃ) আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভুলাভাই দেশাই, পট্টভি সীতারামিয়া, শঙ্কররাও দেও, হরেকৃষ্ণ মহতাব, আচার্য্য কৃপালনী, খান্ আব্দুল গফুর খান্, যমুনালাল বাজাজ, জয়রামদাস দৌলতরাম। শেষোক্ত তিনজন ওয়ার্দ্ধায় উপস্থিত নাই। তাঁহারা পদত্যাগপত্রে তাঁহাদের নাম সংযুক্ত করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ২২শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্রের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তিনি বলেন:—

"বর্ত্তমানে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের পর যে

আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আমি আর কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটি-সদস্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারি না। সভাপতিকে তাঁহার নীতি অনুসরণের স্বাধীনতা দেওয়াই এবং স্বমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতেই স্বীয় সহকর্ম্মীদিগকে বাছাই করিয়া লওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, আমি তাঁহাদের সহিত একমত। ওয়ার্কিং কমিটিতে স্বীয় সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে সব অভিযোগ করিয়াছেন, ঐ সব অভিযোগে বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। যতদূর অবগত আছি, ঐ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। ঐ সব অভিযোগ এবং বিবৃতি যদি মুণাক্ষরেও সত্য না হয়, তবে উহা বিনাসর্ত্তে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে আর কোন মধ্যপন্থা নাই। কংগ্রেসের কার্য্য-পরিচালনার ব্যাপারে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের ও সন্দেহের ভাব থাকা খুবই অন্যায়। ইহাই প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষয়, সে কথা তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে বলিলেও উহার কোনরূপ ব্যবস্থা করার চেষ্টা তিনি করেন নাই।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত একমত হইতে পারি নাই। ঐ সব বিষয় পরিষ্কার বিশ্লেষণ করা আমি প্রয়োজন বোধ করি। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসু অসুস্থ হইয়া পড়ায় উহা পরিষ্কার করিয়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নাই।

বর্ত্তমানে ওয়ার্কিং কমিটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এই সব পরিণতির ফলে ব্যক্তিগতভাবেও শ্রীযুক্ত বসুকে কোনরূপ সাহায্য করিতে আমি পারিব না।

স্থানীয় কংগ্রেসী বিরোধসমূহেরও যথারীতি মামুলী ধারার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া সরাসরি উচ্চতন কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা

অবলম্বনের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে দলবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় এবং তাহাতে গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়া কংগ্রেসের কার্য্য ব্যাহত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থলেই এমন সব পন্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে যে, তাহাতে স্থানীয় বিরোধ কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন স্তরেও ছড়াইয়া পড়িবে ; এ সব দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমি পাকা সমাজতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রে আস্থাবান হইলেও গত কুড়ি বৎসর যাবৎ অনুসৃত মহাত্মা গান্ধীর অহিংস শান্তিপূর্ণ পন্থা সর্ব্বান্তকরণেই গ্রহণ করিয়াছি।”

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পরোক্ষভাবে পদত্যাগই করিয়াছেন। তিনিও যে জনমত উপেক্ষাকারী দলে যোগ দিবেন, ইহা আমাদের ধারণাতীত; কারণ, সুভাষচন্দ্র যাহা বলিয়া আসিতেছেন, কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন এবং যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, তৎসমস্তই পণ্ডিতজীর সুপরিজ্ঞাত এবং পণ্ডিতজীই সে সকলের প্রধান সমর্থক ও পরিপোষক। পণ্ডিত জওহরলাল এতদিন স্বদেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া যে কর্ম্মপন্থার আভাষ দিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র আজ তাহারই অনুবর্ত্তী হইতে চাহিয়াছেন—তথাপি পণ্ডিতজীও সুভাষচন্দ্রের পক্ষ ত্যাগ করিলেন। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি সুভাষচন্দ্রের কার্য্যে সহযোগিতা করিতে পারিবেন না, স্পষ্টভাষায় তিনি ইহারও উল্লেখ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র সংগ্রামশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন

সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, সংগ্রামাত্মক কর্ম্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়া বামপন্থীদের সমর্থন লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার সহিত কিছুতেই সহযোগিতা করা চলিতে পারে না—ইহাই মহাত্মা গান্ধী ও দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের মত। যে মত-বিরোধ সম্বন্ধে এত কথা উঠিয়াছে, তাহা আর কিছুই নহে—তাহা সংগ্রামাত্মক মনোভাব ও সংগ্রামপরিপন্থী মনোভাবের বিরোধ মাত্র। কংগ্রেসের ভাঙ্গন নিবারণের জন্য সুভাষচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আসন্ন ভাঙ্গন নিবারণের জন্য সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতন, এলাহাবাদ ও ওয়ার্দ্ধায় ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল। সুভাষ-সমর্থকদের ৭ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকের পর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঘটনার পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের সংহতি রক্ষাকল্পে সুভাষচন্দ্র ঐকান্তিকতার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই।

বাইশ

প্যাটেল প্রমুখ বারজন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যের পদত্যাগপত্র কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে সুভাষচন্দ্র ঐ পদত্যাগপত্র গ্রহণের কথা পত্রযোগে সদস্যবর্গকে জানাইয়াছেন। ঐ পত্রে তিনি

বলিয়াছেন ঃ—"আপনারা সম্মিলিতভাবে ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্দ্ধা হইতে যে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা যথা-সময়ে আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আমার অসুস্থতার জন্য এতদিন পর্য্যন্ত উহার উত্তর দিতে পারি নাই। সাধারণক্ষেত্রে আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে এবং ত্রিপুরীতে আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতাম। কিন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনারা বিশেষভাবে সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আপনাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের যদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদিগকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ মামুলী অনুরোধে কোন লাভ নাই। কাজেই গভীর দুঃখের সহিত আপনাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতেছি।

আমি মনে করি, আপনাদের পদত্যাগের দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, আপনারা সহযোগিতা প্রত্যাহার করিতেছেন। আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে আমার কার্য্যসম্পাদনে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইব। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা যে মূল্যবান তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমি আরও আশা করি, ত্রিপুরী কংগ্রেসে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য অপেক্ষা ঐক্য অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত

হইবে ; ইহার ফলে আমরা ভবিষ্যতে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইব।

প্রত্যহ আমার জ্বর হইতেছে। আমি অতি ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছি।”

পণ্ডিত জওহরলাল পদত্যাগ করিয়াছেন কিনা তাহা স্পষ্টভাবে জানাইতে বলিয়া সুভাষচন্দ্র পণ্ডিত জওহরলালের নিকট এক পৃথক পত্র লিখিয়াছেন। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, পণ্ডিত জওহরলাল লক্ষ্ণৌয়ে কোন বন্ধুর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছেন— তিনি তাঁহার পত্রে ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যপদ ত্যাগ করেন নাই ; প্রকৃতপক্ষে ওয়ার্কিং কমিটীর বার জন সদস্য পদত্যাগ করায় উহা স্বতঃই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁহার পদত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে না।

পদত্যাগপত্র গ্রহণের ফলে পার্লামেণ্টারী সাব কমিটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মিঃ কৃপালনী আর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী রহিলেন না। ইহার ফলে উক্ত সাব কমিটীর সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা কংগ্রেস সভাপতি ও অবশিষ্ট (শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু) সদস্যের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য আচার্য্য কৃপালনীর স্থলে শ্রীযুক্ত নরসিংহকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

তেত্রিশ

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবর্গের পদত্যাগের ফলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি কিরূপ হইবে তৎসম্পর্কে নানারূপ অভিমত ব্যক্ত হইতেছে। কংগ্রেস সভাপতির সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র তাঁহার দায়িত্বপালনে বিন্দুমাত্র পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই পদত্যাগের ফলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণের পদত্যাগ ও তাঁহাদের এবং মহাত্মাজী ও জওহরলালের অসহযোগের ভীতি প্রদর্শন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে :—

(১) যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা তীব্রতর করা, (২) দেশীয়রাজ্য আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির পুনর্ব্বিবেচনা এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিবাদে ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে তাহাকে শক্তিশালী করার জন্য কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসুর মনোভাব এই যে, কোনরূপ আপোষ-প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়াই ভারত শাসন আইনে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই কর্ম্মসূচীর প্রকাশ খুবই সাময়িক হইয়াছে। দক্ষিণ-পন্থীদের অসহযোগ ও দেশীয় রাজ্যের আরব্ধ সংগ্রাম প্রত্যাহারের চেষ্টার ইহাই সমুচিত উত্তর।

চব্বিশ

রাজকোটের শাসনসংস্কার-প্রণালী প্রণয়নের জন্য কমিটি নিয়োগ সম্বন্ধে সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের সহিত ঠাকুর সাহেবের যে চুক্তি হইয়াছিল সেই চুক্তি যথারীতি প্রতিপালিত না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী রাজকোটে পদার্পণ করেন। ঠাকুর সাহেবকে ঐ চুক্তি পালনে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়া মহাত্মাজী সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়েন। মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরের দাবী করিয়া রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ সময়ের মধ্যেই উত্তর না পাইলে তিনি আমরণ অনশনব্রত অবলম্বন করিবেন—মহাত্মাজীর পত্রে ইহারও উল্লেখ থাকে। ঠাকুর সাহেবের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাওয়ায় মহাত্মাজী ৩রা মার্চ্চ বেলা সাড়ে বারটার সময় অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর অনশনের সংবাদে ভারতব্যাপী উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। রাজকোট সরকারের আচরণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বিশিষ্ট জননায়কগণ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন এবং

করিতেছেন। মহাত্মাজীর এই অনশনে কংগ্রেসশাসিত প্রদেশ-সমূহে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সূচনা হইয়াছে—রাজকোট সমস্যার সমাধান না হইলে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের একযোগে পদত্যাগের সম্ভাবনা রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের আবেদনক্রমে ৫ই মার্চ্চ 'নিখিল ভারত রাজকোট দিবস' প্রতিপালিত হয়। সমগ্র ভারতে ঐ দিন হরতাল পালন করা হয়। ৩রা মার্চ্চ সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর নিকট একটি তারও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পঁচিশ

সভাপতি নির্ব্বাচনের সূচনা হইতে যে সকল বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং সুভাষচন্দ্রের উপর যে সকল অভিযোগ আরোপ করার চেষ্টা হইয়াছে, ঐ সমস্ত খণ্ডন করিয়া সুভাষচন্দ্র ৩রা মার্চ্চ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের প্রধান নেতারা যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আপোষের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেছেন, এ কথা বলিয়া অন্যায় করিয়াছেন—সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের ইহাই গুরুতর অভিযোগ। সুভাষচন্দ্রের নির্ভীক উত্তর এই ঃ—

"আমার পূর্ব্বের বিবৃতিগুলি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে আমি কার্য্যকরী সমিতির সদস্য অথবা সদস্য নহেন, এমন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা নেতার নামে কোন অভিযোগ করি নাই। কংগ্রেসের প্রস্তাবে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনমনীয় বিরোধিতা রহিয়াছে, তথাপি ইহা সত্য যে, কোন প্রতিপত্তিশালী নেতা সর্ত্তাধীনে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ

করিবার জন্য প্রকাশ্যে এবং ঘরোয়াভাবে মত প্রকাশ করিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত দক্ষিণপন্থী কোন নেতা এইরূপ প্রচারকার্য্যের নিন্দা করেন নাই।"

তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির কোন বিশেষ সদস্য বা সদস্যগণের বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। দক্ষিণপন্থীরা যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোষ করিতে ব্যগ্র, জনসাধারণের এই অভিমতই সুভাষচন্দ্র ব্যক্ত করিয়াছেন। সময় থাকিতে কংগ্রেসের আদর্শানুযায়ী সতর্কবাণী উচ্চারণের জন্য সংগ্রামশীল গণপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকামী সেনাপতি ও সৈনিকবৃন্দের ধন্যবাদ ও সমর্থন সুভাষচন্দ্রের প্রাপ্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অন্তরে চরমপন্থী কংগ্রেসী আদর্শ পোষণ করিলেও অদৃশ্য মহাশক্তির প্রভাবে দিকহারা হইয়া সম্প্রতি সভাপতি নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব বিষয়ক যে সাহিত্য রচনা করিতেছেন তাহা নিতান্তই কষ্টকল্পিত। সুভাষচন্দ্র প্রত্যেকটি অভিযোগের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি এখন পণ্ডিতজীর অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, তিনি আমার পুনর্নির্ব্বাচনের বিরোধী ছিলেন। অথচ পণ্ডিতজীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এইরূপ আমার বোম্বাইয়ের কয়েকজন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গত বৎসরের ন্যায় আমি যদি পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রার্থী হই, তবে তিনি উহা সমর্থন করিবেন না; কিন্তু আমি যদি বামপন্থীদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হই, তাহা হইলে উহাতে পণ্ডিতজীর কোন আপত্তি

নাই। উপরোক্ত বিবরণ সত্য কিনা, তাহা আমি জানি না; একমাত্র পণ্ডিতজীই ঐ সম্পর্কে আমাদিগকে যথার্থ বিবরণ জানাইতে পারেন।

'বাম' ও 'দক্ষিণ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতজীর প্রশ্ন করা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। পণ্ডিতজী গত বৎসর হরিপুরায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, উহাতে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কি তিনি নিজে অভিযোগ করেন নাই?

তারপর ওয়ার্কিং কমিটির গত ওয়ার্দ্ধা অধিবেশন এবং এমন কি উহাতে আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকার বিষয়সমূহও আমার ইচ্ছানুসারেই স্থগিত রাখা হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতজী যে অভিযোগ করিয়াছেন, উহাতেও আমি অনুরূপ বিস্মিত হইয়াছি। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা সম্পর্কেও আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইবে বলিয়া আমি কোন পত্রাদি লিখি নাই। এই সম্পর্কে ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার প্যাটেলকে যে তার করিয়াছিলাম তাহার নকল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মাজীর নিকট প্রেরিত তারের মর্ম্ম :—

'চিকিৎসকগণের মতামত জানাইয়া গতকল্য যে তার করিয়াছি উহা অদ্য দেখিয়াছেন। যাহাতে ওয়ার্দ্ধা যাইতে পারি তজ্জন্য সত্বর নিরাময় করিয়া দিবার জন্য চিকিৎসকবৃন্দকে পীড়াপীড়ি করিতেছি; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা কোথায়ও যাইবার অনুমতি দিবেন না। আমি অনুপস্থিত থাকিলেও সাধারণতঃ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের কার্য্য চলিতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা সম্ভব হইবে কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। কাজেই কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে ওয়ার্কিং

কমিটির অধিবেশন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। আপনাকে ত্রিপুরীতে উপস্থিত থাকিতেই হইবে—সুভাষ।'

ওয়ার্দ্ধায় সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট তার—

'মহাত্মাজীর নিকট আমি যে তার করিয়াছি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা দেখিবেন। বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখিতে হইবে; অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সহিত আলোচনা করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তারযোগে তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইবেন।—সুভাষ'

পণ্ডিতজী আর একটি অভিযোগে বলিয়াছেন যে, আমি সভাপতি-পদে থাকাকালীন স্থানীয় কংগ্রেসের গোলযোগসমূহ যথানির্দ্দিষ্টভাবে মীমাংসিত না হইয়া সরাসরি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইয়াছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাকে তিনি প্রমাণস্বরূপ লিখেন :—

'নির্দ্দেশদানকারী রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিকাংশ সময়েই আপনি স্পীকারের মত কার্য্য করিয়াছেন।'

কি মনে করিয়া পণ্ডিতজী এই অভিযোগ করিয়াছেন, আমি তাহা জানি না।

'কংগ্রেসের সহিত দীর্ঘদিনের পরিচয়সত্ত্বেও পণ্ডিতজী কখনো কোন বিশেষদলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন নাই—তাঁহার এই মন্তব্য পড়িয়া আমি বিস্ময় বোধ করিয়াছি। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারিত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তদুপরি, একজন সঙ্কল্পবদ্ধ সমাজতন্ত্রী যে কেমন করিয়া এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হইতে পারেন তাহা আমার ধারণাতীত। শান্তিনিকেতনে পণ্ডিতজীর নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিলাম এবং এলাহাবাদে কমরেড জয়প্রকাশ নারায়ণের

সঙ্গে যে আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে পুনরায় সেই আবেদনের উল্লেখ করিতেছি। দীর্ঘদিন ধরিয়া পণ্ডিতজী আমাদের দেশের চরমপন্থী শক্তির পুরোধাবর্ত্তী হইয়া আছেন। এরূপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে যে, গান্ধীবাদের আদর্শ ও আঙ্গিকের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই। কংগ্রেসী রাজনীতির উপর যে গান্ধীবাদ আরোপ করা হয় তাহা কি? সত্য ও অহিংসাই ইহার মূলনীতি—অহিংস অসহযোগিতাই ইহার কর্ম্মপন্থা। আমাদের মূলনীতি ও পথের বিষয়ে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকিতে পারে না। যদি গান্ধীমতবাদ বলিতে কেহ মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত আচরণ, তাঁহার আহারপদ্ধতি, তাঁহার জীবনযাত্রাপ্রণালী, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, তবে মহাত্মাজীর তথাকথিত গোঁড়া ভক্তদের মধ্যেও কতজন তাহা বিশ্বাস করেন তৎসম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ ইহা নহে যে, অন্ধের মত তাঁহার ইচ্ছা এবং চিন্তাধারার অনুসরণ করিতে হইবে। আমি যদি তাঁহাকে ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি ইহাও বলিতে পারি যে, কোন লোক যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর সত্য ও অহিংসার মূলনীতির বিরোধিতা না করে, ততক্ষণ সে তাহার নিজস্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করিবে ইহা মহাত্মাজীর অভিপ্রেত নয়। তাঁহার প্রতি আমার নিজের মনোভাব এই যে, স্বীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াও আমি তাঁহার বিশ্বাস অর্জ্জনের জন্য সচেষ্ট থাকিব; কারণ প্রতিনিয়তই আমি লিতেছি মহাত্মাজী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানব।"

বর্ত্তমান জাতীয় সঙ্কটে জওহরলাল যদি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' নীতি

পরিত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা করেন, তবে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশন সার্থক হইবে। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের মত ও ঐক্যের উপরেই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

চিকিৎসকগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া ৫ই মার্চ্চ রবিবার রাত্রিতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ই-আই-আরের বোম্বাই মেলযোগে ত্রিপুরী যাত্রা করিলেন। ট্রেন ছাড়িবার পনর মিনিট পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র হাওড়া ষ্টেশনে একটি এম্বুলেন্স্ গাড়ীতে উপস্থিত হন প্ল্যাটফরমে বহু বিশিষ্টব্যক্তি সুভাষচন্দ্রকে মাল্য ও ফুলের তোড়া উপহার দেন। রবিবার সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্রের শরীরের উত্তাপ ছিল ৯৯'৪° ডিগ্রী। ট্রেন ছাড়িবার পূর্ব্বে ডাক্তারগণ তাঁহার শরীর পরীক্ষা করেন। সুভাষচন্দ্রের কামরার সম্মুখে একটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা দুলিতে থাকে। বিপুল বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে ট্রেন চলিতে আরম্ভ করে।

সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। ৫২টি হস্তীবাহিত মনোরম রথে শোভাযাত্রাসহকারে সুভাষচন্দ্রকে বিষ্ণুদত্ত-নগরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁহার জন্য এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। অশীতিপ্রায় বৃদ্ধা জননী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী, ডাঃ সুনীল বসু ও তাঁহার পত্নী এবং কুমারী ইলা বসু ও বাঙ্গালার বহু নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতির অনুগমন করিয়াছেন।

—:০:—